সম্পাদকীয়–

স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ

প্রত্যেক জাতির কাছে মাতৃভূমির মর্যাদা অপরিসীম। স্বদেশপ্রেম-প্রতিটি মানুষের হৃদয়েই সযতনে লালিত। সভ্যতার অগ্রগতির পথে যাযাবর মানুষ এক সময় সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে শুরু করে, এর পর ধীরে ধীরে উদ্ভব ঘটে রাষ্ট্র ব্যবস্থার, যেখানে তারা অন্বেষণ করে জীবন ও সম্পদের নিশ্চয়তা। রাষ্ট্র কতৃক মানুষের জন্য এই যে অবদান- তা যুগান্তকারী এবং সুদূরপ্রসারী। কিন্তু স্বাধীনভাবে চলার এ পথ যখনই রুদ্ধ হয়েছে তখনই মানুষ শিকার হয়েছে নির্যাতন আর নিষ্পেষণের, হারাতে হয়েছে আত্মসম্মান, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ সব। বিচারের বাণী কেঁদে ফিরেছে নীরবে-নিভৃতে। বঞ্চনার সেই অভিজ্ঞতা থেকেই উজ্জীবিত হয়েছে স্বদেশপ্রেম। স্বদেশ যেমন মাতৃস্নেহের ন্যায় আমাদের লালন করে, আমরাও তেমনি স্বদেশের জন্য জীবন পণ করতে শিখে যাই। এজন্যই বুঝি বলা হয়েছে–

হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমানে–অর্থাৎ স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।

স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুগে যুগে মানুষ বিভিন্ন ভাবে মহান গৌরবময় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাই আমাদের এই সুজলা-সুফলা সোনার বাংলাকে ভালোবেসে এর স্বাধীনতা রক্ষায় আর স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে অগণিত বীর সন্তানেরা। বেনিয়া ইংরেজদের তাড়াতে গিয়ে অকাতরে তিতুমির দিয়েছে বুকের রক্ত, স্বদেশের গান গেয়ে ক্ষুদিরাম ঝুলেছে ফাঁসীকাষ্ঠে, কারাগারে অন্তরীণ থেকেও শিকল ভাঙ্গার গান গেয়েছেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। আগ্রাসী কুশাসন থেকে মুক্তির জন্য লড়তে গিয়ে এসব বীর সন্তানেরা কারাবরণ করেছে, ঢেলে দিয়েছে বুকের তাজা রক্ত। স্বদেশের জন্য এই যে ভালবাসা তা দেখিয়ে গেছেন বায়ান্নর মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বাররা বুকের তাজা রক্ত ঝরিয়ে। আমাদের এই সুন্দর দেশটি সেইসব বীর সন্তানদেরই প্রিয় আবাসভূমি। নিজ মাতৃভূমির প্রতি যার শ্রদ্ধা নেই সে আসলে প্রকৃত মু'মিন হতে পারে না।

৩১ ডিসেম্বর ২০০৮

সূচী পত্র	*পৃষ্ঠা নং*
● **কুরআন শরীফ**	৪
● **হাদীস শরীফ**	৫
● **অমৃত বাণী**	৬
● ***জুমুআর খুতবা ঃ*** *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)*	৭-১২
● **কুরআন আমার প্রিয় কুরআন** আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৪-১৮
● **খাতামুন্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)** মাহমুদ আহমদ সুমন	১৯-২২
● **শেষ নবী** সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	২৩-২৪
● **গীবত ও কুৎসার কু-প্রভাব** আনোয়ারা বেগম	২৫-২৯
● **স্মৃতিতে অম্লান এক মহীয়সি নারীর জীবন কথা** সৈয়দ মমতাজ আহমদ	৩০-৩১
● **সংবাদ**	৩২-৩৩
● **কৃষি পাতা**	৩৪-৩৬
● **কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার**	**৩৭**
● **পাক্ষিক আহমদী'র গ্রাহক ফরম**	**৩৮**

প্রচ্ছদ : তারেক আহমদ (সবুজ)

আমাদের উচিত, আমাদের জন্ম ভূমির প্রতি, দেশবাসীর প্রতি, সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ সদা জাগ্রত রাখা। সকল প্রকার নৈরাজ্য থেকে দেশকে রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদের সবার কাঁধে ন্যস্ত। এদেশের শান্তি কেউ যেন বিনষ্ট করতে না পারে সে দিকেও সবার সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের এই দেশে স্বাধীনভাবে সকল ধর্মের অনুসারীরা নিজ নিজ ধর্মের রীতিনীতি পালন করবে বিজয়ের মাসের শেষ লগ্নে এটাই সকলের একান্ত প্রত্যাশা, এখানে ঠাঁই নেই কোন জঙ্গীবাদের বা ধর্মান্ধতার।

স্বদেশবাসীর প্রতি ভালবাসা থেকে উৎসারিত হয় সার্বজনীন মানবপ্রেম। আর সার্বজনীন মানবপ্রেম-এর সেই শিক্ষায় জগতকে আলোকিত করতে আহমদীয়া খিলাফত দ্বিতীয় শতাব্দী পাড়ি দিচ্ছে। দেশে দেশে ভালবাসার অমিয় বাণী ছড়াচ্ছে, শিক্ষা সহায়তা স্বাস্থ্য-সেবা খাদ্য বিতরণে নির্লোভ নির্মোহ নি:স্বার্থ ব্যাপক কার্যক্রম চালাচ্ছে। এ বিষয়ে জানতে আর এর সাথে সম্পৃক্ত হতে আমরা বিজয়ের এ মাসে সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

কুরআন শরীফ
সূরা হূদ-১১

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾

২৬। আর নিশ্চয় আমরা নূহ্‌কে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম। (সে বলেছিল), 'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী,

أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٧﴾

২৭। (এবং এ-ও বলেছিলাম) যে তোমরা আলাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি'[১৩০৯]।

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٨﴾

২৮। কিন্তু তার জাতির অস্বীকারকারী নেতারা বললো, 'আমরা তোমাকে আমাদের মতই একজন মানুষ দেখতে পাচ্ছি। এছাড়া আমাদের মাঝে বাহ্যদৃষ্টিতে[১৩১০] যারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট আমরা কেবল তাদেরকেই তোমার অনুসরণ করতে দেখছি এবং আমাদের ওপর তোমাদের কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বরং আমরা তোমাদের মিথ্যাবাদীই মনে করি।'

১৩০৯। "যন্ত্রণাদায়ক দিবসের শাস্তি" হতে "একটি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি" ভিন্নতর। প্রথমোক্ত শাস্তির দ্বারা শাস্তির অধিকতর ভয়াবহতা বুঝায়। কতক শাস্তি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু কতক এমন দিনও রয়েছে যার কথা স্মরণ হলে মানুষের অন্তর ভয়-বেদনায় কেঁপে ওঠে, অথচ প্রকৃত শাস্তি কেবল তাদের বেদনার কারণ হয় যাদের ওপর এটা আরোপিত হয়। কিন্তু যন্ত্রণাদায়ক দিবসের শাস্তি তাদেরকেও ভীত-বিহ্বল করে যারা পরবর্তীকালে এসে থাকে।

১৩১০। 'বা-দি-আর্-রা'য়ী-অর্থ প্রথম চিন্তাতেই; বাহ্যদৃষ্টিতে যথাযথ বিবেচনা না করে (লেইন)। 'আরা যিলুনা বা-দিয়া আর্-রা'য়ী' অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে নূহ (আ.)-এর অনুসারীগণঃ (ক) বাহ্যদৃষ্টিতেই নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ; (খ) তাদের দৃষ্টি অকপট নয়; (গ) এটা তাদের ভালবাসা বিস্তারেরই ফল। এটা নিতান্তই পরিতাপের বিষয় যে, সকল নবীদের সময়ই বিরুদ্ধবাদীরা আল্লাহর প্রেরিত রসূলের দাবীর সত্যতা যাচাই করার জন্য তাদের নিজস্ব মনগড়া মাপকাঠিতে বিচার করতে গিয়ে সত্যকে বুঝতে পারে না, ফলে তারা ধারণা করে নেয় যে, তারা খোলাখুলি চিন্তাভাবনা করেছে ও যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা করে দেখেছে বলে নবীর দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে বসে।

হাদীস শরীফ
নিমন্ত্রণ

কুরআন ঃ

"এবং প্রত্যেকের জন্যই কোন না কোন লক্ষ্যস্থল আছে যার প্রতি সে (সমস্ত) মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে। সুতরাং তোমাদের লক্ষ্যস্থল এই যে তোমরা পুণ্য অর্জনে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা কর" (আল বাকারা ঃ ১৪৯)।

হাদীস ঃ

আন আবি হুরায়রাতা কালা কালা রসূলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা শাররুত তায়ামিল ওলীমাতে ইউদআ লাহাল আগনিয়াও ওয়া ইউতরাকুল ফুকারাও ওয়া মান তারাকাত দাওয়াতা ফাকাদ আসাল্লাহা ওয়া রাসূলাহ্ (বুখারী)।

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন সবচাইতে নিকৃষ্ট নিমন্ত্রণ এটা যেখানে গরীবদের অবজ্ঞা করে (শুধু) ধনীদের নিমন্ত্রণ করা হয়। আর কেউ যদি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে তবে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য (বুখারী)।

ব্যাখ্যাঃ ইসলাম টাকার পাহাড় না গড়তে ও ধনী-গরীবের মধ্যে পার্থক্য মিটানোর যে শিক্ষা দিয়েছে তা সুস্পষ্ট। এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় বৈষম্যের অবতারণা ঘটে সামাজিক ভাবে চলা ফেরা ও উঠা-বসার মধ্যে। সেখানেই এমন ভাবটি ফুটে উঠে যেন পূর্ব পশ্চিমে অবস্থিত দু'টি গোষ্ঠী। এর ফলশ্রুতিতে স্থায়ী ঘৃণ্য ও হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়। ইসলাম এই দ্বন্দ্বকে মিটানোর জন্য যে শিক্ষা দিয়েছে তা বিরল। সুতরাং প্রথমতঃ এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের ভাই আখ্যা দিয়ে বড় প্রাচীরকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে। এবং সকলকে এক কাতারে দাঁড় করিয়েছে। নামাযের মাধ্যমে সবাই এই ঐক্যের অনুভূতি লাভ করেছে। নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ধনী-গরীবের বৈষম্যকে মিটিয়ে খোদাভীতিকে প্রাধান্য দিয়েছে। এভাবে সামাজিকভাবে সবাইকে সমান চোখে দেখার শিক্ষা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে। ধনী ও গরীবের মাঝে সামাজিক সম্পর্ককে সাধারণ করার লক্ষ্যে আঁ হযরত (সা.) এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন কোন ধনী ব্যক্তি দাওয়াত দেয় সেখানে যেন গরীবদের নিমন্ত্রণ দেয়া হয়। অনুরূপভাবে এই শিক্ষাও দিয়েছেন যে, যখন কোন গরীব ব্যক্তি ধনী ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ দেয় ধনী ব্যক্তি যেন উহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। সুতরাং উপরোক্ত হাদীসে জোরালো ভাষায় উক্ত শিক্ষাকে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত রসূল করীম (সা.) আরেক স্থানে বলেন যে, "কোন গরীব ব্যক্তি ছাগলের একটি পা রান্না করেও যদি আমাকে নিজ ঘরে আমন্ত্রণ করে আমি অবশ্যই ওই নিমন্ত্রণকে গ্রহণ করবো।"

তাই ইসলামী শিক্ষাকে সামনে রেখে দৈনন্দিন জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা যেন সবাই এই শিক্ষার ওপর আমল করি, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

....এটাই মাহদী ও যুগ মসীহ্‌র আবির্ভাবের সময়, কেননা ভ্রষ্টতা সর্বত্র ছেয়ে গেছে এবং পৃথিবী অশান্তিতে ভরে গেছে। বিভিন্ন প্রকার নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিয়েছে আর বিশৃঙ্খলাপরায়ণদের হট্টগোল অনেক বেড়ে গেছে। কুরআনে শেষ যুগের যেসব লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর প্রত্যেকটি চক্ষুমানদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে।

যারা আরব বা পাশ্চাত্যের কোন দেশ থেকে মাহদীর আগমনের অপেক্ষা করছে তারা মস্তবড় ভুল করছে। তাদের চিন্তা সঠিক নয়, কেননা আরব দেশগুলো এমন যাকে আল্লাহ্ তাআলা অশান্তি, নৈরাজ্য ও যুগ-কাফেরদের সৃষ্ট সব বিশৃংখলা থেকে নিরাপদ রেখেছেন। যে দেশে ভ্রষ্টতার ঝড় বয়ে যাচ্ছে সে দেশ ছাড়া অন্য কোথাও মাহদীর আগমনের আশা করা যেতে পারে না। মহাপ্রতাপান্বিত খোদার রীতি এভাবেই চলে আসছে। আমরা জানি, ভারতবর্ষ বিভিন্ন প্রকার নৈরাজ্যেরর জন্য বিশেষত্ব রাখে।

এখানে ধর্মত্যাগের দ্বার খুলে গেছে, সব ধরনের অনাচার, কদাচার, অন্যায় ও মিথ্যার বিস্তার ঘটেছে। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই, এ দেশই মহা সম্মানিত ও শক্তিশালী খোদার সাহায্য লাভের এবং তাঁর পক্ষ থেকে মাহদীর আগমনের একান্ত মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্‌র কসম। ভারতে যেরূপ বিশৃঙ্খলা দেখছি এর উদাহরণ আমরা অন্য কোথাও দেখতে পাই না। আর খ্রীষ্টানদের সৃষ্ট এই নৈরাজ্যের মত অন্য কোন পরীক্ষার সম্মুখীনও আমরা হই নি। সহীহ্ হাদীসে আছে, দাজ্জাল প্রাচ্যের দেশ থেকে আবির্ভূত হবে। আর কুরআনও স্পষ্ট লক্ষণাবলীর আলোকে সে দিকে ইঙ্গিত করে। সুতরাং আমাদের জন্য এসব প্রমণিত ও স্পষ্ট লক্ষণাবলীর আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়া আবশ্যক আর আমরা অস্বীকারকারীদের না মানার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করি না।

যারা মক্কা বা মদীনায় মাহ্‌দীর আগমনের অপেক্ষা করে তারা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিপতিত। এমনটি হওয়া অসম্ভব। কেননা আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়ায় এ কল্যাণমন্ডিত ভূমির নিরাপত্তা বিধান করেছেন। দাজ্জালের ত্রাস সেখানে প্রবেশ করবে না। সেখানকার অধিবাসীরা এ ফিতনার গন্ধও পাবে না। সুতরাং যে দেশে দাজ্জাল আবির্ভূত হয় সে দেশের অধিবাসীরাই সর্বশক্তির আধার খোদার দয়ার অধিক যোগ্য। আর যার অবতরণের কথা, তাঁর স্বর্গীয় জ্যোতির সাথে সেভাবে প্রেরিত হওয়া উচিত যেভাবে দাজ্জাল পার্থিব শক্তি নিয়ে শয়তানের মত আবির্ভূত হয়েছে। মাহ্‌দীর গুহায় লুকিয়ে থাকা সম্পর্কে যা বলা হয়, চক্ষুমানদের মতে এরও কোন ভিত্তি নেই। এটি এদের ঠিক তেমনই একটি কথা যেভাবে বলা হয়ে থাকে, “ঈসা মারা যান নি, তাঁকে সশরীরে আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় তিনি আসবেন।” অথচ কুরআন সুস্পষ্টভাবে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেয়।

সত্যিকার অর্থে ঈসা ও ইমাম মোহাম্মদ (ইবনে হাসান আসকারী) উভয়ের দেহ বিচ্ছেদ ঘটেছে আর তাঁদের প্রভু তাঁদেরকে মৃত্যু দিয়েছেন এবং পুণ্যবানদের সাথে তাঁদেরকে মিলিত করেছেন।

(অবশিষ্ট ১৩ এর পাতায় দেখুন)

আল্লাহ্ তা'লা মু'মিন প্রজন্মকে তাদের সৃষ্টির উদ্যেশ্যের নিকটতর রাখার জন্য বরং সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য পুণ্যবান বান্দাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন যে, তারা যেন নিজেদের সন্তান-সন্ততি বরং স্ত্রীদের জন্যও দোয়া করেন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ-اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ-

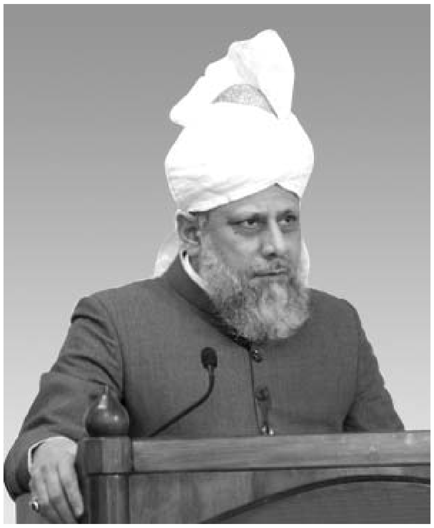

সৈয়দনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই:) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ'তে প্রদত্ত ১৪ই নভেম্বর, ২০০৮ এর (১৪ই নবুয়ত-১৩৮৭ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

আল্লাহ্ তা'লার একটি গুণবাচক নাম হলো ওয়াহেব বা ওয়াহাব। আভিধানিকগণ এই শব্দের যে সকল অর্থ এবং ব্যাখ্যা করেছেন তা অনেকটা অভিন্ন তাই আমি আরবী অভিধান গ্রন্থ লিসানুল আরব যে অর্থ করেছে, তা নিয়েছি। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে **'আল্ ওয়াহাব** খোদা তা'লার একটি গুণবাচক নাম বা সিফ্‌ত। **আল মুনয়েমু আলাল্ ইবাদ্** অর্থাৎ, বান্দাদের পুরস্কার দাতা। অনুরূপভাবে খোদা তা'লার একটি সিফ্‌ত বা বৈশিষ্ট্য হলো **ওয়াহেব**। তিনি লিখেন **আল হেবা** এমন দানকে বলা হয়, যার বিনিময়ে কিছু নেয়া বা অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে। এমন দান যদি অজস্র ধারায় করা হয় তাহলে এর দাতাকে ওয়াহাব বলা হয়।

এই শব্দ মানুষের জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিন্তু খোদা তা'লার সত্ত্বাই হলেন প্রকৃত ওয়াহাব বা দাতা, যিনি নিজ বান্দাদের চাইলেও দিয়ে থাকেন আবার অযাচিত ভাবেও দান করেন এবং প্রচুর দিয়ে থাকেন। একজন প্রকৃত মু'মিন যদি গভীরভাবে চিন্তা করে তবে, খোদা তা'লার ওয়াহাব অর্থাৎ তাঁর দান ও পুরস্কারের দৃষ্টান্ত সদা প্রত্যক্ষ করতে পারে। এটিই আমাদের জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ, খোদা তা'লার দান এবং কৃপা তার চোখে পড়ে না। যে বস্তুবাদিতার চোখে দেখে সে বস্তুবাদী জগতকেই লব্ধ এ সকল নিয়ামতের কারণ মনে করে।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এই শব্দ ও নিজের এই সিফত বা গুণবাচক নামের কথা উল্লেখ করেছেন। নবী এবং পুণ্যবান লোকদের উপর নিজ দানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার এই গুণবাচক নামের বরাতে দোয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যে দোয়াগুলোর মধ্যে, নেক সন্তান-সন্ততির জন্যও দোয়া রয়েছে, সমাজের পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দোয়া রয়েছে, নিজেদের ত্বাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি এবং ঈমানের দৃঢ়তার জন্যও দোয়া রয়েছে, বস্তুত এই গুণবাচক নামের বরাতে কুরআনে অনেক দোয়া রয়েছে।

এখন আমি এ সকল কুরআনী দোয়ার প্রেক্ষাপটে একটি দিক তুলে ধরবো। আল্লাহ্ তা'লা মু'মিন প্রজন্মকে তাদের সৃষ্টির উদ্যেশ্যের নিকটতর রাখার জন্য বরং সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য পুণ্যবান বান্দাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন যে, তারা যেন নিজেদের সন্তান-সন্ততি বরং স্ত্রীদের জন্যও দোয়া করেন। আর স্ত্রীদেরকে বলেছেন তারা

যেন নিজেদের স্বামী ও সন্তানদের জন্য দোয়া করেন, যাতে নেকীর প্রেরণা বংশ পরম্পরায় সৃষ্টি হওয়া অব্যাহত থাকে এবং প্রজন্মান্তরে তা যেন জাগরুক থাকে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

> وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا۝

(সূরা আল্ ফুর্কান:৭৫)

অর্থাৎ- 'এবং যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীগণের ইমাম বানাও।

এটি একটি কামেল দোয়া, অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের জন্য নয়নের স্নিগ্ধতার কারণ কর এবং এমন সন্তান দাও যাদের দেখলে নয়ন জুড়ায়। যেখানে স্বয়ং খোদা এই দোয়া শিখাচ্ছেন যে, চোখ শীতল করার জন্য দোয়া কর সেখানে এটি প্রকৃতপক্ষে খোদার সেই অনন্ত কৃপাবারীর জন্য দোয়া যার জ্ঞান মানুষের নেই বরং শুধু খোদা তা'লাই জানেন, যাকে মানবীয় চিন্তাভাবনা আয়ত্তই করতে পারে না। আর আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে যেসব পুণ্যের কথা বলেছেন তার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততি পরস্পরের জন্য শুধু এই পৃথিবীতেই নয়নের স্নিগ্ধতার কারণ হয় না বরং মৃত্যুর পরও মানুষ পৃথিবীতে যে পুণ্যকর্ম করে সেই নেকীর কারণে খোদা তা'লা তাদেরকে আপন নিয়ামতে ভূষিত করেন। একজন মু'মিনের মৃত্যুর পর তার নেক সন্তান সেই নেকী এবং পুণ্যের ধারা জারী রাখে যার উপর তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পিতামাতার জন্য নেক সন্তান দোয়া করে যা তাদের মর্যাদার উন্নয়ন ঘটায়। তারা অন্যান্য যেসব সৎকর্ম করে তাও তাদের মর্যাদাকে উঁচু করে। সন্তান সন্ততির নেকী এবং পিতা-মাতার জন্য তাদের দোয়া পরকালেও একজন মু'মিনের জন্য নয়নের স্নিগ্ধতার কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

> فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۝

(সূরা আস্ সাজদা:১৮)

অর্থ: 'বস্তুত: কেউই জানে না যে, তাদের জন্য তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানস্বরূপ কি কি নয়ন-তৃপ্তিকর বস্তু গোপন করে রাখা হয়েছে।' এটি সে সমস্ত লোকদের জন্য বলা হয়েছে যারা খোদাভীতির কারণে হৃদয়ে খোদাকে লালন করে, খোদার ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং তাঁর পথে খরচও করে এবং অন্যান্য সৎকর্মও করে। তারা রাতে উঠে নিজেদের সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততির সঠিক পথে পরিচালিত হবার জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ্ তা'লার কাছে এমন নয়নের স্নিগ্ধতার জন্য তারা দোয়া করেন, যার জ্ঞান শুধু খোদা তা'লাই রাখেন। নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্য অর্থাৎ স্ত্রী'রা স্বামীদের জন্য এবং স্বামীরা স্ত্রীদের জন্য খোদা তা'লার দরবারে দোয়া করেন যেন তারা সকলেই ত্বাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলকে পৃথিবীতেও যেন সেই নিয়ামত দান করেন যা তার সন্তুষ্টির কারণ হবে আর পরকালেও যেন তারা খোদার নৈকট্য অর্জনকারী হতে পারে। অতএব এই হলো তাদের দোয়া যারা ইবাদুর রহমান, যারা সতত পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এই দোয়া করেন। আর নিজেদের পিছনে এমন সন্তান রেখে যাওয়ার চেষ্টা করেন যারা নেকীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এই দোয়া শিখিয়ে খোদা তা'লা নিরন্তর আমাদের দৃষ্টি সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি আকর্ষণ করেছেন, যা শুধু আমাদের নিজেদের জন্য তার সন্তুষ্টির কারণ হবে তাই নয় বরং ভবিষ্যত প্রজন্মও যেন সেই নেকীর উপর পরিচালিত হয় যা খোদার কৃপা ও ফযলের উত্তরাধিকারী করবে।

وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا বলে আল্লাহ্ তা'লা একথা স্পষ্ট করেছেন যে, নয়নের স্নিগ্ধতা তখনই লাভ হতে পারে যদি তোমরা নিজেরাও ত্বাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং তোমাদের সন্তান সন্ততিও ত্বাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যদি তোমাদের নিজস্ব কর্ম থেকে ত্বাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ না ঘটে তাহলে তোমরা নিজস্ব গন্ডিতে মুত্তাকীদের ইমামও হতে পারবে না।

অতএব আমাদের প্রত্যেককে নিজের অবস্থা ও অবস্থানকে খতিয়ে দেখতে হবে যে, আমরা এই দোয়া করার পর পারস্পরিক অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ত্বাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত কি না? সন্তানদের শিক্ষা ও তরবিয়তের জন্য সেই শর্ত মোতাবেক কাজ করছি কি-না যা তাদেরকে ত্বাকওয়ার পথে পরিচালিত করবে। যদি পারিবারিক পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রী ত্বাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দাবী অনুসারে জীবন যাপন না করে, তাহলে সন্তানের পক্ষে নিজের দোয়া কবুল হওয়ার নিদর্শন কি করে দেখা সম্ভব হতে পারে? আর ত্বাকওয়াই যদি না থাকে তাহলে খিলাফত এবং জামাতের কল্যাণ থেকে কিভাবে মানুষ অংশ পেতে পারে?

খিলাফতের জন্য খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে সৎকর্মকে শর্ত নির্ধারণ করেছেন। যদি খোদাভীতিই না থাকে, ত্বাকওয়াই না থাকে তাহলে সৎকর্ম কিভাবে হবে আর নেককর্মই যদি না থাকে তাহলে ত্বাকওয়া কোথা থেকে আসবে? আর ত্বাকওয়া যদি না থাকে তাহলে পরস্পর পরস্পরের জন্য নয়নের স্নিগ্ধতার কারণ হতে পারেনা আর সন্তানও কখনো হৃদয়ের প্রশান্তি বা নয়নের স্নিগ্ধতার কারণ হতে পারে না। অতএব সন্তানকে নয়নের স্নিগ্ধতা বা হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিজেদের অবস্থা এবং নিজেদের ইবাদতকে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখা আবশ্যক যে, আমরা সেই মহান মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করছি কিনা।

মহানবী (সাঃ) স্বামী-স্ত্রীর ইবাদত সম্পর্কে নিম্নলিখিত নসীহত করেছেন। তিনি (সাঃ) বলেন যে, **'খোদা তা'লা সে ব্যক্তির উপর রহম করুন যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং স্ত্রীকে জাগায়। যদি সে উঠতে না চায় তাহলে তার মুখে পানির ছিটা দেয় যেন সে উঠে নামায আরম্ভ করে। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা সেই মহিলার উপর রহম করুন যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং স্বামীকে জাগায়। স্বামী যদি উঠতে আলস্য প্রদর্শন করে তাহলে তার মুখে পানির ছিটা দেয় যেন স্বামী দন্ডায়মান হয়।'**

সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে হৃদয়ের প্রশান্তি যদি লাভ করতে হয় তাহলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই দায়িত্ব নিজেদের ইবাদতের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা। অনেক পুরুষ সম্পর্কে অভিযোগ আসে যে তারা, নামাযের জন্য উঠাতো দূরের কথা, মহিলাদের জাগানো সত্ত্বেও, মনোযোগ আকর্ষণ করার পরও ফজরের নামায ছাড়া অন্যান্য নামাযের বেলায়ও দুর্বলতা দেখিয়ে থাকে। এমন মানুষ কিভাবে এবং কোন মুখে

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ

এর দোয়া পড়ে? সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে হৃদয়ের প্রশান্ত হওয়ার দোয়া তারা কিভাবে করতে পারে? আল্লাহ্‌র কাছে কিভাবে এ আশা রাখে যে, তাদের সন্তান মুত্তাকী হওয়ার দোয়া গৃহীত হবে! হ্যাঁ খোদা তা'লা যদি অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে চান তাহলে ভিন্ন কথা, তিনি করতে পারেন কেননা তিনি তো মালিক। কিন্তু ত্বাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নির্দেশও খোদা তা'লাই দিয়েছেন। যদি তার ফযল এবং কৃপা থেকে অংশ পেতে হয় তাহলে নিজেদের অবস্থা সংশোধন করার নির্দেশও খোদা তা'লাই প্রদান করেছেন। অতএব যারা প্রতাশা রাখে যে, সন্তান-সন্ততি তাদের নয়নের স্নিগ্ধতার কারণ হোক তাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই উক্তি স্মরণ রাখতে হবে; কেননা **'ভাল তরবিয়তের তুলনায় উত্তম কোন উপহার নেই যা একজন পিতা তার সন্তানকে দিতে পারে, বা দেয়া সম্ভব।'** আর ভাল তরবিয়ত তখনই সম্ভব যদি মানুষের নিজের কর্ম তার সন্তানের জন্য আদর্শ-স্থানীয় হয়। ইবাদতের মান উন্নত হতে হবে আর অন্যান্য কর্মও উত্তম হওয়া চাই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, **'খোদা তা'লা আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে নয়নের স্নিগ্ধতা দান করুন। এটি তখনই সম্ভব যদি মানুষ স্বয়ং অনাচার এবং পাপাচারিতাপূর্ণ জীবনকে ঘৃণা করে অর্থাৎ ইবাদুর রহমান হয়ে জীবন যাপন করে আর খোদা তা'লাকে সকল কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়।'** এরপর মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন যে, **'এরপর আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে**

'আমাদের জামাতের জন্য আবশ্যক আমরা যেন ধার্মিক হবার জন্য নিজ স্ত্রীদেরকে ধার্মিকতার শিক্ষা দেই। নতুবা তারা গোনাহ্‌গার বা পাপাচারিনী হবে। আর যখন কোন স্ত্রী স্বামীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলতে পারে যে, তোমার মধ্যে অমুক অমুক দোষ-ত্রুটি আছে তাহলে সেই স্ত্রী কিভাবে আল্লাহ্‌কে ভয় পাবে? তার মধ্যে কোন ত্বাকওয়া থাকবে না এমন পরিবেশে সন্তানও নষ্ট হয়ে যায়। সন্তানকে পবিত্র বানাতে হলে তাকে একটি পবিত্র পরিবেশ দিতে হবে নতুবা সন্তান নষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য সময় থাকতে তওবা করা উচিৎ এবং সন্তানের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। নারীরা স্বামীর পরিচর্যাকারীনি হয়ে থাকেন তাই স্বামী কখনই স্ত্রীর কাছে নিজ দুর্বলতা লুকোতে পারে না। এটি মনে করা উচিৎ নয় যে, সে কিছু বুঝে না বা নির্বোধ। পতি যদি পবিত্র স্বভাবের হয় তাহলে সেই গৃহের পত্নী তাকে ভয় করবে এবং খোদাকে ভয় পাবে। সহধর্মীনি তার স্বামীর প্রভাবে প্রভাবান্বিতা হয় তাই স্বামী যত বেশি নেকী বা পুণ্যের পথে পরিচালিত হবে তা থেকে স্ত্রী কিছু না কিছু অংশ অবশ্যই গ্রহণ করবে।'

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا সন্তান যদি নেক এবং মুত্তাকী হয় তাহলে এমন ব্যক্তিই তাদের ইমাম হবে অর্থাৎ এতে মুত্তাকী হওয়ার দোয়া শিখানো হয়েছে।'

তো এই দায়িত্ব সর্বপ্রথম পুরুষের উপর বর্তায় অর্থাৎ সেই পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করতে হবে যা তাকে রহমান খোদার বান্দায় পরিণত করবে। নারীরাও ঘরের তত্ত্বাবধায়িকা হিসেবে এর জন্য দায়ী অর্থাৎ ত্বাকওয়ার উপর পরিচালিত হয়ে নিজেদের এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততি এবং স্বামীদের তরবিয়ত করা তাদের দায়িত্ব, যাতে তারা সমাজের জন্য উপকারী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। কিন্তু মহিলাদের তরবিয়তের জন্যও প্রথমে পুরুষদের পদক্ষেপ নিতে হবে। উভয়ে যদি নেকির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হয় তাহলে সন্তানও পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করবে আর উভয়ের দোয়া সন্তানের তরবিয়তে সহায়ক হবে।

আমি পূর্বে একটি হাদীস বর্ণনা করেছি যে, পুরুষ যদি প্রথমে জাগে তাহলে সে মহিলাকে জাগাবে, আর মহিলা প্রথমে জাগলে পুরুষকে জাগাবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পরস্পরের প্রতি যদি গভীর প্রেম ও অনুরাগ থাকে তাহলেই এটি সম্ভব, তারা যদি পরস্পরের মন বোঝে, যদি তারা বুঝে যে, আমাদের রাতের ইবাদত এবং নামাযের হেফাযত করতে হবে আর সে কারণেই প্রভাতে জাগার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে। বোঝাপড়া না থাকলে, পুরুষ যদি ঘুমিয়ে থাকে, (অনেক সময় অভিযোগ আসে) এবং স্ত্রী তাকে নামাযের জন্য জাগায় ফলে হতভাগিনীর উপর মহাবিপদ নেমে আসে। কঠোর কথা শুনা ছাড়াও এমন মহিলার মার খাওয়াও বিচিত্র নয়। আমি শুধু কথার কথা বলছি না, কোন কোন ঘরের এটি বাস্তব চিত্র বা বাহ্যিক চিত্র। ধীরে ধীরে বেচারী চুপ হয়ে যায়, নীরবে নিজের নামাযের হিফাযত করে অথবা স্বামীর রীতি অনুসরণ করে। এমন ঘরের বাচ্চারা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা উন্নতি ও পড়ালেখা করলেও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিকৃত হয়ে যায়। বরং ঘরের পরিস্থিতি যদি এমন হয় তাহলে অনেক সময় জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অনেক সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। তাই সন্তানকে নয়নের মণি হিসেবে যদি দেখতে হয় তাহলে পিতামাতাকে নিজেদেরও সংশোধন করতে হবে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন যে, **'আমাদের জামাতের জন্য আবশ্যক আমরা যেন ধার্মিক হবার জন্য নিজ স্ত্রীদেরকে ধার্মিকতার শিক্ষা দেই। নতুবা তারা গোনাহ্গার বা পাপাচারিনী হবে। আর যখন কোন স্ত্রী স্বামীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলতে পারে যে, তোমার মধ্যে অমুক অমুক দোষ-ত্রুটি আছে তাহলে সেই স্ত্রী কিভাবে আল্লাহ্কে ভয় পাবে? তার মধ্যে কোন ত্বাকওয়া থাকবে না এমন পরিবেশে সন্তানও নষ্ট হয়ে যায়। সন্তানকে পবিত্র বানাতে হলে তাকে একটি পবিত্র পরিবেশ দিতে হবে নতুবা সন্তান নষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য সময় থাকতে তওবা করা উচিৎ এবং সন্তানের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। নারীরা স্বামীর পরিচর্যাকারীনি হয়ে থাকেন তাই স্বামী কখনই স্ত্রীর কাছে নিজ দুর্বলতা লুকোতে পারে না। এটি মনে করা উচিৎ নয় যে, সে কিছু বুঝে না বা নির্বোধ। পতি যদি পবিত্র স্বভাবের হয় তাহলে সেই গৃহের পত্নী তাকে ভয় করবে এবং খোদাকে ভয় পাবে। সহধর্মীনি তার স্বামীর প্রভাবে প্রভাবান্বিতা হয় তাই স্বামী যত বেশি নেকী বা পুণ্যের পথে পরিচালিত হবে তা থেকে স্ত্রী কিছু না কিছু অংশ অবশ্যই গ্রহণ করবে।'** এই হলো সে প্রত্যাশা হযরত যা মসীহ্ মওউদ (আ:) প্রত্যেক আহমদী পুরুষের কাছে করেছেন বা পোষণ করছেন। এই শব্দগুলো আমাদেরকে আন্দোলিত করার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত, পুরুষের উপর অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায়। অতীতকালে নারীরা অজ্ঞ ছিল, তাদের বিদ্যা ছিল যৎ সামান্য, এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় শিক্ষার আলো নারীর বুদ্ধি-চেতনার মানকে অনেক বিকশিত করেছে। আমি পূর্বেই বলেছি, জামাতে এমন মহিলাও আছেন বরং তারা জামাতের ভেতর সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী, যারা পুরুষের দুর্বলতার কারণে অনেক কষ্ট পান এবং পুরুষের কঠোর ব্যবহারের কারণে হতোদ্যম হয়ে পড়েন। নিজেরা নেকীর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করেন আর স্বামীর তুলনায় সন্তান-সন্ততির তরবিয়তের ব্যাপারে বেশী উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হন। অনেক সময় যা হয় তা হলো, পুরুষদের বিপথগামীতা দেখে স্বামী থেকে স্ত্রী পৃথক হয়ে যান, খোলা নিয়ে নেন। এর ফলে সন্তানের উপর বড় বিরূপ প্রভাব পড়ে। এই সমাজে যেখানে বিশেষভাবে শিশুদের জন্য পিতার নিগরানী এবং তত্ত্বাবধানের অনেক প্রয়োজন সেখানে এমন শিশুরা যৌবনে উপনীত হতেই ভুল পথে পা বাড়ায়। বলা যায়, এসব কিছুর জন্য দায়ী হলো পুরুষ, এমন পুরুষদের চিন্তা করা উচিত। কতবড় দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের খোদা আমাদের অস্তিত্ব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য দোয়া শিখাচ্ছেন। খোদা তা'লার দোয়া

শিখানোর অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'লা সেই দোয়া কবুল করতে চান এবং করেন। আর দোয়ার বাক্যে **'হাবলানা'** শব্দকে অন্তর্ভূক্ত করে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, তোমাদের কাছ থেকে তাঁর কিছু পাবার নেই। তোমাদের ইহকাল এবং পরকালকে সুনিশ্চিত করার জন্য, তোমাদের পরবর্তী প্রজন্মের নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য, সঠিক পথে চলার রীতি শিখিয়ে তিনি তোমাদের পুরস্কৃত করছেন এবং বলেন যে, যদি এ পথে পরিচালিত হও তাহলে নিয়ামত পাবে, পুরস্কার পাবে; কিন্তু পরিতাপ! আমরা এই নিয়ামত থেকে অংশ নিচ্ছিনা। অতএব আমাদেরকে আত্মজিজ্ঞাসার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সে পথে চলার চেষ্টা করা উচিত যা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ হবে, সদা নিজদের গৃহের শান্তি বজায় থাকার কারণ হবে এবং সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকেও আমাদের আত্মিক প্রশান্তির কারণ হবে আর সত্যিকার অর্থেই প্রত্যেক আহমদী গৃহে ত্বাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মানুষের জন্ম হোক। আহমদী সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি ত্বাকওয়ার উপর বিচরণকারী হোক আর এর কল্যাণেই আমরা খিলাফতের নিয়ামত থেকে পুরোপুরি লাভবান হতে পারবো। আর এটিই মহানবী (সা:)-এর আনুগত্যে ও অনুসরণে আগমনকারী মসীহ্ মওউদের জামাতের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ব পালনে সহায়ক হবে। অতএব আমাদের ভেতর তারাও ভাগ্যবান, যারা এই সত্যকে বুঝে ওয়াহাব খোদার কাছে যখন চায়, খোদা তা'লা এ পৃথিবী এবং পরকালেও তাদের জন্য এমনভাবে নয়নের স্নিগ্ধতা এবং হৃদয়ের প্রশান্তির ব্যবস্থা করবেন যা মানুষ ভাবতেও পারে না।

আমাদেরকে আত্মজিজ্ঞাসার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সে পথে চলার চেষ্টা করা উচিত যা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ হবে, সদা নিজদের গৃহের শান্তি বজায় থাকার কারণ হবে এবং সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকেও আমাদের আত্মিক প্রশান্তির কারণ হবে আর সত্যিকার অর্থেই প্রত্যেক আহমদী গৃহে ত্বাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মানুষের জন্ম হোক। আহমদী সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি ত্বাকওয়ার উপর বিচরণকারী হোক আর এর কল্যাণেই আমরা খিলাফতের নিয়ামত থেকে পুরোপুরি লাভবান হতে পারবো। আর এটিই মহানবী (সা:)-এর আনুগত্যে ও অনুসরণে আগমনকারী মসীহ্ মওউদের জামাতের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ব পালনে সহায়ক হবে।

সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে এখানে আরেকটি কথা আমি বলতে চাই যা অনেক সময় ঘর-ভাঙার কারণ হচ্ছে বা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক তিক্ত সম্পর্কের কারণে সন্তান-সন্ততির উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ; আর তা হলো, ছেলে কেন হচ্ছে না শুধু মেয়ে কেন হচ্ছে। কেবল এ কারণে অনেক স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হয় বা স্ত্রীর প্রতি নিছক এ কারণেই স্বামী অসন্তুষ্ট থাকে যে, তার গর্ভে ছেলে কেন হয়না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

(সূরা আশ্ শূরা:৫০)

অর্থ: 'তিনি যাকে চান কন্যা দান করেন এবং যাকে চান পুত্র দান করেন।' আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, যাকে চান তিনি ছেলে দেন আর যাকে চান তিনি মেয়ে দেন। অন্যত্র বলেন, যাকে চান, ছেলে-মেয়ে দু'টোই দান করেন। এটি খোদা তা'লার দান। খোদার এই দানের কারণে কাউকে অভিযুক্ত করা ত্বাকওয়া বহির্ভূত। এ যুগে খোদা তা'লা মানুষকে যে জ্ঞান এবং চিকিৎসা রীতি এবং পদ্ধতি শিখিয়েছেন তা অনুসরণে বা একে কাজে লাগিয়ে অনেকের উপকারও হয়। যাদের ছেলের বাসনা থাকে তাদের ঘরে ছেলেও হয় কিন্তু অনেক সময় খোদা তা'লাই যে স্রষ্টা তা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন আর আপন ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। সেক্ষেত্রে লক্ষ চিকিৎসা করলেও কোন লাভ হয় না। অধিকন্তু মেয়ে কেন হয় এই প্রশ্নে স্ত্রীদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলা বা মেয়েদেরকে সেভাবে পিতৃস্নেহ না দেয়া যেভাবে তাদের স্নেহ পাবার অধিকার আছে, সবসময় তাদেরকে খোঁটা দেয়া; মেয়েদের হৃদয়ে পিতার বিরুদ্ধে একটি ঘৃণার জন্ম দেয়। এ ধরনের বিষয় যখন আমার সামনে আসে তখন বিস্মিত হতে হয় যে, এ যুগেও এমন মানুষ আছে যারা মেয়েদের উপর সেভাবে যুলুম এবং অত্যাচার করছে যা অতীতকালে আরবের অজ্ঞ যুগের ইতিহাসে দেখা যায়। তখন কারও ঘরে মেয়ে হলে, অনেকের চেহারা মলিন হয়ে যেত, অতএব এগুলো অজ্ঞতাপ্রসূত কথা এবং ধ্যান-ধারণা; প্রত্যেক মু'মিন এবং প্রত্যেক আহমদীকে এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত।

আমি একটি আহমদী পরিবারকে জানি,

এটি অনেক দিনের পুরনো কথা। সে ব্যক্তির ঘরে শুধু মেয়ে হতো, প্রথম স্ত্রীর ঘরে চার পাঁচটি মেয়ে হয়, তিনি ছেলের বাসনায় দ্বিতীয় বিয়ে করেন। সেই স্ত্রীর ঘরেও দুই-তিনটি মেয়ে হয়। ছেলের আশায় তিনি আরেকটি বিয়ে করেন। সেই মহিলার গর্ভে আরও তিন চারটি মেয়ে হলো। এরপর তিনি চতুর্থ বিয়ে করেন, সেখানেও আল্লাহ্ তা'লা তাকে মেয়েই দিয়েছেন। অবশেষে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভেই প্রথম ছেলে সন্তান জন্ম নেয় পূর্বে যার গর্ভে কেবল মেয়েই হচ্ছিল। অতএব এটি খোদা তা'লার ইচ্ছা, যাকে চান যেভাবে চান তিনি দান করেন। তাই যদি সন্তানই চাইতে হয়, ছেলেই যদি চাইতে হয়, ঝগড়া-বিবাদ না করে, ঘরে অশান্তি সৃষ্টি না করে, ত্বাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে খোদা তা'লার কাছে চাওয়া উচিত এবং নেক সন্তানের জন্য দোয়া করা উচিত। খোদা তা'লা আমাদেরকে পবিত্র কুরআনে নবীদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে দোয়া শিখিয়েছেন। এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

(সূরা আস সাফ্‌ফাত:১০১)

অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৎ কর্মশীল পুত্র দাও।' অন্যত্র এই দোয়া শিখিয়েছেন,

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

(সূরা আলে ইমরান:৩৯)

অর্থ: 'হে আমার প্রভু! তুমি তোমার সন্নিধান হতে আমাকে পবিত্র সন্তান-সন্ততি দান করো।' অতএব সবসময় এমন সন্তানের জন্য দোয়া করা উচিত বা বাসনা পোষণ করা উচিত, যারা পবিত্র ও নেক হবে এবং যারা পুণ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত হবে। আর সবসময় সে যেন নয়নের স্নিগ্ধতার কারণ হয়, এ দোয়া করা উচিত। অনেকেই আমার কাছে ছেলে সন্তান লাভের বাসনা বা ইচ্ছা ব্যক্ত করে চিঠি লিখেন, আমি সব সময় তাদেরকে বলি, পুণ্যবান এবং সুস্থ্য সন্তানের জন্য দোয়া করুন। অনেক সময় মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় পিতামাতার বেশি সেবা করে আর বেশী নেক হয়ে থাকে। পিতা-মাতার জন্য তারা সুনাম বয়ে আনে, আর অপরদিকে ছেলেরা অনেক সময় বদনামী ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে থাকে। অতএব একজন মু'মিনের এটিই পরিচয় হওয়া উচিৎ, সন্তানের জন্য দোয়া করতে গিয়ে সে যেন নেক এবং সুস্থ্য-সবল সন্তানের জন্য দোয়া করেন। সে স্থায়ীভাবে এ দোয়া করে যে, সন্তান যেন তার নয়নের স্নিগ্ধতার কারণ হয় নতুবা এমন সন্তানে লাভ কি যে বদনামী বা দুশ্চিন্তার কারণ হয়। অনেক চিঠি আমার কাছে আসে যাতে ছেলে নষ্ট হওয়ার কারণে দুশ্চিন্তার কথা লেখা থাকে। অনেকে ব্যক্তিগত সাক্ষাতেও এমন দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে থাকেন। আসল বিষয় হলো, হৃদয়ের প্রশান্তি এবং সন্তানের নেক ও পুণ্যবান হওয়া। যদি এটি না হয় তাহলে সন্তান-সন্ততির কোন অর্থ নেই।

এটি খোদা তা'লার ইচ্ছা, যাকে চান যেভাবে চান তিনি দান করেন। তাই যদি সন্তানই চাইতে হয়, ছেলেই যদি চাইতে হয়, ঝগড়া-বিবাদ না করে, ঘরে অশান্তি সৃষ্টি না করে, ত্বাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে খোদা তা'লার কাছে চাওয়া উচিত এবং নেক সন্তানের জন্য দোয়া করা উচিত।

সালেহীন বা পুণ্যবানের যে সংজ্ঞা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বর্ণনা করেছেন তা এখানে তুলে ধরছি। তিনি বলেন, **'সালেহীন বা পুণ্যবানদের ভেতর কোন প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাধি থাকে না, কোন প্রকার বিশৃংখলা বা ক্রুটিবিচ্যুতি থাকে না।'**

অতএব আমাদের সন্তান-সন্ততি যাতে এ মান অর্জনে সক্ষম হয় সে জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত। আমাদের নিজেদেরকেও এর উপর প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করা উচিত যেন ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে নেকীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং পবিত্র প্রজন্মের ধারা যেন অব্যাহত থাকে। বংশ-পরম্পরায় যারা পিতা-মাতার জন্য নয়নের স্নিগ্ধতার কারণ হবে এবং পরিবারের জন্য, ও জামাতের জন্য সুনাম কুড়িয়ে আনবে। আমি বলেছি যতক্ষণ আমরা নিজেদের অবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি না রাখবো, বা মনোযোগ না দেবো এবং আমরা নিজেরা যতক্ষণ পুণ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত না হবো এবং ত্বাকওয়ার উপর চলতে অভ্যস্ত না হবো ততক্ষণ পর্যন্ত এটি সম্ভব নয়। অতএব এটিকে অবলম্বন এবং এর উপর অনুশীলন ও এর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

(প্রাপ্ত সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন)

(অমৃতবাণীর অবশিষ্টাংশ ৬ষ্ঠ পৃঃ পর)

আল্লাহ্ কোন বান্দাকে অস্বাভাবিক বয়স দেন নি আর তাদের সবাই নশ্বর ছিলেন। যেসব বর্ণনায় মসীহ্র জীবিত থাকার উল্লেখ আছে, তা পড়ে তুমি অভিভূত হয়ো না। আর যেসব উক্তিতে ইমামের জীবিত থাকার কথা আছে সেগুলো স্পষ্ট হলেও এর প্রতি কর্ণপাত করো না। সেগুলো রূপক কথা মাত্র। এতে বিচক্ষণ লোকদের জন্য ইশারা-ইঙ্গিতে বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এ রহস্য উন্মোচনকারী উক্তি এবং পর্দা অপসারণকারী শ্রেষ্ঠবাণী হলো, আল্লাহ্র একটি আদি রীতি ও একটি চলমান নিয়ম রয়েছে। কখনও কখনও শত্রুদের মুখ বন্ধ করতে, বন্ধুদের শুভ সংবাদ দিতে আর আপন খোদাভীরু বান্দাদেরকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে তিনি মৃত পুণ্যবানদের জীবিত আখ্যা দিয়ে থাকেন। যেভাবে আল্লাহ্ শহীদদের সম্পর্কে বলেন, 'তোমরা তাদের মৃত বলবে না বরং তারা জীবিত'। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে, কাফেররা মু'মিনদের হত্যা করে আনন্দিত হয় এবং তারা বলে, আমরা তাদের হত্যা করেছি আর আমরাই জয়যুক্ত হয়েছি। একইভাবে, বিশ্বপ্রতিপালকের পথে নিহত হওয়া সত্ত্বেও কিছু মুসলমান তাদের ভাই, বন্ধু, পিতা ও সন্তানদের মৃত্যুতে ব্যথিত হন। আল্লাহ্ শহীদদের জীবনের কথা উল্লেখ করে লাঞ্ছিত কাফেরদের মুখ বন্ধ করেন এবং দুঃখভারাক্রান্ত মু'মিনদের শুভসংবাদ দেন, তাদের প্রিয়জন জীবিত, তাঁরা মারা যান নি আর মরতে পারেন না। তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে তিনি বলেন নি যে, তাদের জীবন আধ্যাত্মিক জীবন বা ইহলোকবাসীদের জীবনের মত নয়; সে অজানা জীবনকে তাঁর **'ইনদা রাব্বিহিম ইউরযাকুন'** (আলে ইমরান ঃ ১৭০) (অর্থ তাঁদেরকে তাঁদের প্রভুর সম্পর্কে রিযক দেয়া বা) উক্তির মাধ্যমে সুনিশ্চিৎ জীবন আখ্যা দেন এবং কাফেরদের দাবী খন্ডন করেন।

ঈসা মারা যান নি এ কথা শুনে তোমার আশ্চর্য হবার কি আছে? এ ধরনের কথা সেসব লোকদের জন্যও ব্যবহার হয়েছে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন। এটি সর্বসম্মত বিষয় যে তারা [অর্থাৎ শহীদরা–অনুবাদক] মারা গেছেন, রক্ত ঝরিয়ে তাঁদের হত্যা করা হয়েছে আর তারা নিঃসন্দেহে মাটিতে সমাহিত হয়েছেন। মহা সম্মানিত খোদার গ্রন্থে যে শহীদদের জীবনের কথা উল্লেখ আছে তা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়, অথচ তাঁদের মৃত্যুর ঘটনা যে সঠিক সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং ঈসার জীবনের এমন বাড়তি কি শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশেষত্ব আছে? অধিকন্তু কুরআনও তাঁকে মৃত আখ্যা দিচ্ছে। অতএব ভেবে দেখ, কেননা বিচার দিবসে সব বিশ্বাসঘাতকতা ও কপটতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে। সেদিন মিথ্যাবাদীরা হঠকারিতা, অবজ্ঞা ও উপেক্ষার জন্য অনুশোচনা করবে। কিন্তু সময় পেরিয়ে যাবার পর অনুতপ্ত হয়ে লাভ নেই। আল্লাহর আগুন সেদিন মিথ্যাবাদীদের হৃদয়ে আঘাত হানবে। সুতরাং মিথ্যাবাদীদের জন্য ধ্বংস, যারা সীমালঙ্ঘন করা থেকে বিরত হয় না, বরং তারা প্রতিদিন প্রতিনিয়তই সীমালঙ্ঘন করছে। তুমি যদি যাচাই বাছাই না করে অন্ধের মত সমস্ত দুর্বল কান-কথার অনুসরণ করতে থাকো তাহলে তোমার বিশ্বাসঘাতকতাকে প্রমাণ করার জন্য এটিই যথেষ্ট। একই সাথে একথা সাব্যস্ত হবে, তুমি অজ্ঞতা থেকে নিজের হৃদয়কে পবিত্র কর না, কুপ্রবৃত্তির পূজারী ও ফিতনাপ্রিয় লোকদের ন্যায় বাহ্যিক চাকচিক্যের অনুসারী এবং পবিত্র লোকদের ন্যায় তুমি সুগন্ধির সন্ধান কর না।

তুমি জান মৃতের জন্য 'আহ্ইয়া' আর জীবিত ব্যক্তির জন্য 'আমওয়াত' শব্দের ব্যবহার কুরআনের সূরা এবং দ্ব্যর্থহীন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। যারা কুরআনের জ্ঞান রাখে এবং কুরআনকে চিন্তাশীলদের মত পাঠ করে আর দরজা খোলার মানসে তাঁর (অর্থাৎ খোদার) দ্বারের কড়া নাড়ে এমন অনুসন্ধানীদের এটি অজানা নয়। সুতরাং সেই রাত যা এক শ্রেণীর আলেমের জন্য তমসাচ্ছন্ন, তা তোমার জন্য এ সমুজ্জ্বল সত্যের মাধ্যমে আলোকিত হবে। পরিতাপ, যেসব আলেম প্রথমে সোজা সরল পথে ছিল, তারা একপর্যায়ে বক্রতা অবলম্বন করেছে!

তুমি হয়তো বর্ণনার পরে বলতে পারো, তত্ত্বজ্ঞানীদের মত 'জীবনের' স্বরূপ আমিও বুঝলাম কিন্তু 'নূযুল' বা 'অবতরণ' শব্দের এমন কি যুক্তিযুক্ত অর্থ আছে যা হৃদয়কে প্রশান্ত করতে পারে? তোমার জানা প্রয়োজন, এটি এমন একটি শব্দ কুরআনে যার বহুল ব্যবহার রয়েছে। প্রশংসিত খোদা কুরআনের বিভিন্নস্থানে উল্লেখ করেছেন, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বস্তু আকাশ থেকেই নাযেল হয়। প্রত্যেক বস্তু স্বীয় উৎকর্ষ মহিমান্বিত খোদার নির্দেশে ওপর থেকেই প্রাপ্ত হয়। ভূমি যে বস্তুকে গ্রহণ করে যাকে উর্দ্ধালোক প্রেরণ করে। আর প্রকৃতি সে রঙ ধারণ করে যা ওপর থেকে দেয়া হয় আর এভাবেই কোন আত্মাকে সৌভাগ্যবান বা দুর্ভাগা ও সত্যবিচ্যুত সাব্যস্ত করা হয়। পুণ্যবান ও পাপী উভয় শ্রেণীর মাঝে কিছু সংখ্যক মানুষ কিছু সংখ্যক মানুষের সাথে সাদৃশ্য রাখে আর প্রতিনিয়ত তাদের সামঞ্জস্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তাদেরকে একই জিনিষ মনে হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টার এটিই চলমান রীতি। আর তাঁর নিজ উক্তি 'তাশাবাহাত কুলুবুহুম'-এর মাধ্যমে মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত খোদা সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। সুতরাং যাকে চিন্তা শক্তি দেয়া হয়েছে তার ভেবে দেখা উচিত।

(পুস্তক ঃ 'সিররুল খিলাফাহ্' বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা, ৬৩-৬৬)

কুরআন আমার প্রিয় কুরআন

আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

(৮ম ও শেষ কিস্তি)

জামাল ও হুসনে কুরআঁ নূরে জানে হার মুসলমাঁ হ্যা

ক্বমর হ্যা চান্দ আওরোঁ কা হামারা চান্দ কুরআঁ হ্যা ॥

(কুরআনের রূপ সৌন্দর্য প্রত্যেক মুসলমানের প্রাণের আলো।

পূর্ণিমার চাঁদ তো অন্যদের চাঁদ, মোদের চাঁদ কুরআন – দুর্‌রে সামীন)।

কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তাআলার এ মহান কালামের যতই প্রশংসা ও মর্যাদার কথা আমরা বর্ণনা করিনা কেন তা খুবই নগণ্য। এতক্ষণ যা আলোচনা করা হলো এসবই কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব বহন করে। আল্লাহ্ তাআলাই স্বয়ং সূরা কাহাফের ১১০ আয়াতে বলেছেন ঃ

কুল লাও কানাল বাহরু মিদাদাল্লি কালিমাতি রাব্বি লানাফিদাল বাহরু ক্বাবলা আন তানফাদা কালিমাতু রাব্বি ওয়ালাও জি'না বি মিছলিহী মাদাদা –অর্থাৎ তুমি বল সাগর যদি আমার প্রভু-প্রতিপালকের কালামসমূহের জন্যে কালি হয়ে যায়, তথাপি আমার প্রভু-প্রতিপালকের কালামসমূহ শেষ হওয়ার আগেই সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে যদিও আমরা এর সাহায্যার্থে সমপরিমাণ (সাগর) আরও এনে দেই।

অন্য আর একস্থানে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

ওয়ালাও আন্না মা ফিল আরযি মিন শাজারাতিন আকলামূঁ ওয়াল মাহরু ইয়ামুদ্দুহূ মিম্ বা'দিহী সাবআতু আবহুরিম্মা নাফিদাত কালিমাতুল্লাহ্- ইন্নাল্লাহা আযীযুন হাকীম– অর্থাৎ, আর পৃথিবীতে যত গাছপালা আছে সব যদি কলম হয় এবং এই যে সাগর রয়েছে এর সাথে আরও সাতটি সাগর কালি যদি যোগ হয় তবুও আল্লাহ্‌র বাণী শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময় (সূরা লুকমান ঃ ২৮)।

তাই কুরআন করীমের গভীর মাহাত্ম্য ও প্রশংসা এবং মাকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে এর মালিক মহান আল্লাহ্ তাআলাই বিশেষভাবে অবহিত আছেন। তবুও ক্ষুদ্র জ্ঞানের ডালি নিয়ে আমরা আল্ কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিনীতভাবে কয়েকটি কথা আলোচনা করার চেষ্টা করছি ঃ

কুরআন কিতাবুল্লাহ্ এবং কালামুল্লাহ্

আল্লাহ্ তাআলা মানুষের হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্যে বহু সহীফা এবং শরীয়তের কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এর মাঝে তাওরাত এবং কুরআন বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু কুরআন করীম ছাড়া অন্য কিছুকে গ্রন্থ হিসেবে উপস্থাপন করার অঙ্গীকার আল্লাহ্ তাআলা করেন নি। এগুলো কিতাবুল্লাহ্ কালামুল্লাহ্ নয়। কুরআনের প্রত্যেকটি কথা আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ। অন্য কোন কিতাব এরকম নয় বা এদের এরকম কোন দাবীও নেই। আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তাআলা কুরআনের সূরা আল ক্বিয়ামাহ-এর ১৮ আয়াতে বলেন, **ইন্না আলায়না জামআহু ওয়া কুরআনাহূ** অর্থাৎ নিশ্চয় এ (কিতাব) সংকলন করার ও পাঠ করে শুনাবার দায়িত্ব আমাদের ওপর। বুখারী শরীফ থেকে জানা যায়, প্রথমদিকে কুরআনের কোন অংশ অবতীর্ণ হলে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তা মুখস্থ করার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠতেন। উপরোক্ত আয়াতের পরবর্তী আয়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে – তিনি যেন এ অভ্যাস পরিহার করেন। আবার এর পরবর্তী ৩টি আয়াতে তাঁকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা নিজে কুরআনের অবতীর্ণ বাণীকে বিশুদ্ধাবস্থায় রক্ষা তো করবেনই, এ ছাড়া এগুলো সংগৃহীত করে পবিত্র ও মনোরম গ্রন্থের আকৃতি দান করবেন (ইন্ট্রুডাকশন টু দি হোলি কুরআন দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তাআলার সরাসরি তত্ত্বাবধানে আল কুরআনকে গ্রন্থবদ্ধ করে সেভাবে সাজিয়েছেন যেভাবে এখন তা আমাদের কাছে রয়েছে। আল কুরআনের কালামুল্লাহ্ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ স্বয়ং কুরআনের সূরা বাকারার ২৪ আয়াতে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন–আর তোমরা যদি এর সম্বন্ধে সন্দেহে থাক যা আমরা অবতীর্ণ করেছি তাহলে তোমরা এর অনুরূপ এক সূরা উপস্থাপন কর এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য সাহায্যকারীকে ডাক, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক। কুরআনের আরও কোন কোন স্থানে এরূপ চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে যেমন, সূরা ইউনুস ঃ ১৯, সূরা হূদ ঃ ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৯, সূরা তূর ঃ ৩৪-৩৫। এদের কোন কোন স্থানে একটি আয়াত বা দশটি আয়াতের চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। আজ প্রায় পনরশ বছর যাবৎ কুরআনের এ শাশ্বত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় কেউ একটি আয়াতও রচনা করতে সক্ষম হয় নি বা এটা প্রমাণ

করতে সক্ষম হয় নি যে মহান কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম নয়। বরং অনেক বিরুদ্ধবাদী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে এ কুরআন প্রকৃতই আল্লাহ্‌র কালাম বা কথা।

আরবী উম্মুল আল সিনা বা সব ভাষার জননী। এখানে উল্লেখ্য, এ প্রসঙ্গে যুগ ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর পুস্তক 'মীনানুর রহমান'-এ প্রমাণ করেছেন যে সব ভাষার মূল হলো আরবী। আরবী থেকে সব ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। এটাও কুরআনেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

কুরআন পরিপূর্ণ ঐশী কিতাব ও পরিপূর্ণ ঐশী জীবন বিধান

কুরআন করীম ছাড়া অন্য কোন ঐশী কিতাবের এ দাবী নেই যে পরিপূর্ণ ঐশী কল্যাণ ও অনুগ্রহ এতে ভরপুর দেয়া হয়েছে। আল কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা দাবী করেন,**–আল ইয়াওমা আকমালতুলাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলায়কুম নি'মাতী ওয়া রাযীতু লাকুমুল ইসলামা দীনা**–অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দীনরূপে মনোনীত করলাম (সূরা মায়েদা ঃ ৪ আয়াত)। কুরআনের এ দাবী শুধু কথার কথা নয়। বরং কুরআনের অনুসারীগণ যে বিগত ১৪ শতাব্দী কাল ধরে আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তাআলার নেয়ামতসমূহ লাভ করে চলেছেন ইতিহাস এর সাক্ষ্য। এর আগে বিগত ধর্ম অনুসরণ করে মু'মিন বান্দারা সালেহ ছাড়াও শহীদ ও সিদ্দীক পর্যন্ত হতে পারতেন যেমন কুরআন করীম বলে, **ওল্লাযীনা আমানূ বিল্লাহি ওয়া রসূলিহী উলাইকা হুমুস্ সিদ্দিকূনা ওয়াশ্ শুহাদাউ 'ইনদা রাব্বিহিম লাহুম আজরুহুম নূরুহুম**.....অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে সিদ্দীক শহীদদের পর্যায়ভুক্তড়-(সূরা হাদীদ ঃ ২০ আয়াতাংশ) কিন্তু মহান আল্লাহ্ ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের জন্যে সালেহ, শহীদ, সিদ্দীক ও নবুওয়াতের কল্যাণ নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে। যেভাবে মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **ওয়া মাঁইউতিইল্লাহা ওয়াররসূলা ফা উলাইকা মাআল্লাযীনা আনআমাল্লাহু আলায়হিম মিনান্নাবীয়্যিনা ওয়াস্ সিদ্দীক্বীনা ওয়াশ্ শুহাদাই ওয়াস্ সালেহীন- ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফীক্বা** অর্থাৎ আর যারা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করবে তারা সেই সব লোকদের মাঝে গণ্য হবে যাদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করেছেন অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহদের মাঝে। আর এরাই সাথী হিসেবে উত্তম (সূরা নিসা ঃ ৪)। বর্তমান যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ তথা উম্মতী নবী (আ.) দাবী করেছেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পূর্ণ আনুগত্য এবং অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে। এখন এ ঐশী কল্যাণ কেবল কুরআন করীমের অনুসারীদের জন্যেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অন্য কোন ঐশী কিতাবের ধারক ও বাহকদের বেলায় এ নেয়ামতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ্ আলা যালিক।

আল্লাহ্ তাআলার যে নেয়মত ও কল্যাণের কথা এতক্ষণ বর্ণনা করলাম তা কেবল উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্যেই নির্ধারিত। এ ছাড়া আরও ২টি নেয়ামতের সংবাদ দিয়েছে কুরআন করীম এবং তা কোন দিন বন্ধ হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। একটি সামষ্টিক ও একটি ব্যক্তিগত। সামগ্রিক কল্যাণ হলো খিলাফতের কল্যাণ। সূরা নূরের ৫৬নং আয়াতে এ শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে। উম্মত যতদিন মু'মিন থাকবে এবং আমলে সালেহ করবে ততদিন তাদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এ ধারায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হন। এভাবে খিলাফতে রাশেদীনের ধারা হযরত উমর, হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এরপর মুসলমানদের মাঝে বিকৃত ঘটার দরুন সাময়িক ভাবে এ কল্যাণ যথার্থ অর্থে অব্যাহত না থাকলেও বিগত তেরশ বছর ধরে মুজাদ্দিদিয়তের আকারে অব্যাহত ছিল। বিগত চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত আল্লাহ্‌র ফযলে আবার জারী হয়েছে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে। বর্তমানে এ ধারার ৫ম খিলাফত চলছে। ইনশাআল্লাহ্ এ খিলাফতের ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। নবী করীম (সা.) এবং ইমাম মাহদী (আ.)-এর কথায় তো তা-ই বুঝা যায়।

মহান কুরআন উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্যে আরও একটি নেয়ামতের কথা ঘোষণা করেছে সূরা ক্বদরে। এটা রমযান মাসেই উম্মতের জন্যে একটি এমন রাত রাখা হয়েছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ রাতটি সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াত রয়েছে। সে যা-ই হোক এটা যে রমযান মাসে এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে

এটা যে সবার জন্যে একই দিন বা একই ক্ষণে লাভ হবে সে কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। কঠোর সাধনার ফলে মু'মিন যখন আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করে সেটাই তার লায়লাতুল ক্বদর। আর এ মহূর্তটি তার সারা জীবন অর্থাৎ হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ মুহূর্তটি লাভ করার জন্যে প্রত্যেক মু'মিনকে সারা রমযান, সারা বছর, সারা জীবন চেষ্টা সাধনা করার দিকেই আহ্বান জানাচ্ছে কুরআন করীম। আর এটা লাভেই তার জীবন হবে সার্থক ও ধন্য।

কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশী গ্রন্থ ঃ এর সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে

প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পারি জিনিষের স্থায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে এর সংরক্ষণ ব্যবস্থা নির্ণয় করা হয়েছে। যে জিনিষ অধিক কাল ধরে কল্যাণ প্রদায়ী এর সংরক্ষণ ব্যবস্থা তত উন্নত মানের। কুরআন করীমের বেলায়ও তা-ই হয়েছে। যেহেতু কুরআন করীম পরিপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বকালীন ঐশী গ্রন্থ তাই এর সংরক্ষণ ও হেফাযতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মহান আল্লাহ্ তাআলা। ইতোপূর্বে যেসব ঐশীগ্রন্থ ও সহীফা অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলো ছিল সীমাবদ্ধকাল ও নিদৃষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্যে। তাই ওগুলোর সংরক্ষণ বা হেফাযতের কোন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি। আল্ কুরআন যেহেতু গোটা বিশ্বের মানবের উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং কিয়ামতকাল অব্দি এ গ্রন্থ পথের দিশা দিতে থাকবে তাই কুরআন মজীদের মালিক হেফাযতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন কুরআনেই আল্লাহ্ সুবহানুহু তাআলা বলেছেন, **ইন্না নাযযালনায্ যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লা হাফীযুন** অর্থাৎ আমরাই এ যিকর অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী (সূরা হিজর ঃ ১০)।

আজ থেকে প্রায় ১৫শ বছর আগে কুরআন করীম অবতীর্ণ হয়েছে। এর মাঝে পৃথিবীতে ঘটে গেছে বহু উত্থান ও পতন। টাইগ্রিস ও ফোরাতে অনেক জল গড়িয়েছে। কুরআন মজীদের বাহ্যিক হেফাযত হয়েছে লক্ষ লক্ষ কুরআন মজীদ ছাপার মাধ্যমে। আর কুরআনে রয়েছে এমনই বৈশিষ্ট্য যাতে মানুষ গোটা কুরআন মুখস্থ করতে পারে এর দাড়ি কমা সহ। এটা আল্লাহ্ সুবহানুহু তাআলার মহাদান। তাই পৃথিবীতে অগণিত হাফেয তৈরী হয়েছেন যারা যুগের পর যুগ কুরআন করীমের হেফাযত করে আসছেন। এর একটি অক্ষর কেন একটি নোকতারও হের ফের হয়নি এ ১৪শ বছরে। আর কুরআনের অভ্যন্তরীণ শিক্ষার রক্ষা ব্যবস্থা–তা আরও অভিনব ও আশ্চর্যজনক। বিগত শতব্দীগুলোতে মুজাদ্দিদগণের প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তাআলা কুরআনের শিক্ষাকে সংরক্ষণ করে আসছেন যখনই এর মাঝে কোন বিকৃতির চেষ্টা করা হয়েছে। আর শেষ যুগে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কুরআনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য তথা উৎকৃষ্ট শিক্ষার জন্যে পাঠিয়েছেন হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী আলায়হেস সালামকে, আলহামদুলিল্লাহ্। কুরআনের এ হেফাযত আরও সুসংহত করেছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদী জামাআত এবং এর খিলাফত। আজ পর্যন্ত প্রায় ষাটের অধিক ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তফসীর প্রণীত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে।

কুরআনের এ হেফাযত ব্যবস্থা সম্পর্কে ইসলামের ঘোরতর বিদ্বেষী ও সমালোচক প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম মুইর-এর বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কাছে যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল তা-ই আজও বিদ্যমান আছে। অতএব তিনি বলেন, আমরা খুব জোরের সাথেই বলতে পারি, মুহাম্মদ কর্তৃক রচিত (নাউযুবিল্লাহ্) কুরআনের প্রতিটি বাক্যই অপরিবর্তিত, অবিকৃত ও অকৃত্রিম রয়েছে........অন্যান্য বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় সংরক্ষিত মূল গ্রন্থ যা আমাদের কাছে রয়েছে তা-ই মুহাম্মদ স্বয়ং প্রণয়ন করেছেন এবং প্রচার করতেন (Introduction to the life of Mohomet by Sir William Muir)। এখানে উল্লেখ্য, উইলিয়াম মুইর কুরআনকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক রচিত বলে মনে করেন। কিন্তু তিনি এটা প্রমাণ করতে পারেন নি। তবুও তার লেখায় কুরআনের আদি ও অকৃত্রিম হওয়া অবলীলায় প্রমাণিত। এখানে আরও উল্লেখ্য, বাইবেল কম করে হলেও ৫০০ বার পরিবর্তিত করা হয়েছে। একথা সবারই জানা। অথচ কুরআনে মানবীয় হস্তক্ষেপ হয়নি, হতে পারে নি। যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নেয়া যায়, বিরুদ্ধবাদীরা সারা দুনিয়ার কুরআন করীমকে ধ্বংস করে ফেলেছে; সব হাফেযকে মেরে ফেলেছে তাহলেও আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদকে হেফাযত করতে সক্ষম। এর একটি প্রমাণ হিসেবে–লেলিন গ্রান্ডের যাদুঘরে হযরত উসমান (রা.)-এর কুরআন খানা সংরক্ষিত–পেশ করা যেতে পারে। মহান হেফাযতকারী আল্লাহ্ তাআলা নাস্তিকদের দিয়ে তাঁর পাক কালামের হেফাযতের ব্যবস্থা করেছেন।

আল কুরআন সার্বজনীন–আপামর মানবের জন্যে হেদায়াত গ্রন্থ ঃ

একমাত্র কুরআন শরীফের দাবী এই, এ

কিতাব গোটা মানবজাতির হেদায়াতের আলোকে বর্তিকাস্বরূপ। প্রাচ্য-প্রতীচ্য, ধনী-নির্ধন, কালো-ধলো, নর-নারী নির্বিশেষে সব মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনকল্পে এ কিতাব মানুষের প্রভু-প্রতিপালক মালিক ও উপাস্যের কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই কুরআন মজীদের দাবী –**শাহারু রামাযানাল্লাযী উনযিলা ফিহিল কুরআনু হুদাল্লিন্নাসি ওয়া বায়্যিনাতিম্‌ মিনাল হুদা ওয়াল ফুরক্বান** অর্থাৎ, রমযান সেই মাস যাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে কুরআন যা মানবজাতির জন্যে হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরক্বানের (সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারীর জন্যে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ..... (সূরা বাকারা ঃ ১৮৬ আয়াতাংশ)

কুরআন মজীদের এই সার্বজনীন হওয়ার দাবীর প্রেক্ষাপটেই কুরআনের বাণীকে গোটা মানবমন্ডলীর কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে মুসলমানগণ চেষ্টা করে–বিশেষ করে আহমদী মুসলমানগণ তা করছে ও করে যাচ্ছে। তারাতো এ পর্যন্ত প্রায় ১০০ টি ভাষায় কুরআন মজীদ অনুবাদ করেছে। আহমদীয়া জামাআত মনে করে, প্রত্যেক ব্যক্তির মাতৃভাষায় কুরআন পাঠ করে এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া তার মৌলিক অধিকার বিশেষ। আর এ অধিকারের দাবী যতক্ষণ পূরণ করা না হবে ততক্ষণ কুরআন প্রচারের হক্‌ ও কর্তব্য সঠিক ও পুরোপুরি পালিত হবে না। বিশ্বের কোণে কোণে তাই আহমদী জামাআত ও প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে কুরআন প্রচারে লিপ্ত রয়েছে আল্লাহ্‌র ফযল ও করমে। কিন্তু অন্য কোন ধর্মীয় গ্রন্থে ঢালাওভাবে সকলের কাছে তা প্রচার করার আদেশ তো দেয়াই হয়নি। কিন্তু অন্য কোন ধর্মীয় গ্রন্থে তা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এ সত্ত্বেও আশ্চর্য হতে হয় যে তাদের ধর্মগ্রন্থে নিম্নোক্ত আদেশ থাকার পরও মসীহী জামাত খ্রিষ্টানরা নানা ছলে বলে কৌশলে কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামী কায়দা কানুন যেমন 'ইঞ্জিল শরীফ', নবী-রসূল' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করে সারা বিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার করছে–"তিনি (অর্থাৎ যীশু) উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই" (মথি ঃ ২৪ ঃ ২৫ পদ)। তবে কেন মসীহী জামাআত নাসারতীয় মসীহর বাণী নিয়ে অইসরাঈলীদের কাছে যায় তা আমাদের বোধগম্য নয়। বৈদিকদের ধর্মগ্রন্থ বেদেও একথা লেখা আছে–কোন শুদ্র যদি বেদ বাক্য শ্রবণ করে তাহলে 'তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেবার বিধান রয়েছে'। আর কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রকে বেদ শিক্ষা দিলে সে-ও সেই শূদ্রের সাথে রৌরব নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হবে। বেদের উপরোক্ত কথায় এটাও যে প্রমাণিত হয়, বেদ সার্বজনীন নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কুরআন করীমে এ ধরনের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। এ কিতাব মহান রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সারা বিশ্বের সারা মানবগোষ্ঠীর জন্যে উন্মুক্ত পুস্তক। এতে সকলের প্রবেশাধিকার ও জ্ঞান সংগ্রহ করে পথ নির্দেশনা লাভের সুযোগ আছে বরং একথা বলবো, নির্দেশ আছে।

কুরআন করীম পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থগুলোর নির্যাস

মহান আল্লাহ্‌ তাআলার পরিকল্পনা ছিল সর্বকালের সব মানুষের জন্যে একখানা পরিপূর্ণ জীবন বিধান তথা ঐশী গ্রন্থ দান করা। আর এ লক্ষ্যেই তিনি যুগে যুগে মানবের জন্যে সময়োপযোগী ধর্মীয় বিধান অবতীর্ণ করে আসছেন। সবার শেষে তিনি খাতামুন্নাবীয়্যিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছিলেন পরিপূর্ণ মহাগ্রন্থ আল্‌ কুরআন। আল কুরআনের সূরা বাইয়্যেনাহ্‌-এর ৪ আয়াতে দাবী করা হয়েছে –**ফীহা কুতুবুন কাইয়্যেমাহ** অর্থাৎ এর মাঝে পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোর শিক্ষা সন্নিবেশ করা হয়েছে। ইসলামী ইবাদতের বিধান এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিস্তারিত আলোচনা সুযোগ নেই এখানে।

শব্দ প্রয়োগের দিক থেকেও কুরআনে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত

কুরআনের বাচন ভঙ্গী ও শব্দ প্রয়োগের প্রতি দৃষ্টি দিলে আশ্চর্য ও মোহিত হতে হয়। এমনিতেই কুরআন আরবী ভাষায় রচিত যা কিনা উম্মুল আল সিনা বা ভাষার জননী। এর ওপর মহান আল্লাহ্‌ তাআলা এর রচয়িতা। তাই মহান কুরআনের রচনা শৈলী সত্যিই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর শব্দগুলো নিজের মাঝে অতি ব্যাপক ও গভীর অর্থ বহন করে থাকে। এসব ভাষাতত্ত্ববিদদেরকেও চমৎকৃত ও মোহিত করে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি কুরআন করীম গদ্যে না পদ্যে রচিত তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। মণিমুক্তা স্থাপনে অলংকারের শোভা ও সৌন্দর্য যেমন বহুগুণে বেড়ে যায় তেমনই আল কুরআনের শব্দ প্রয়োগ ও বাক্য গঠন একে আরও সুসামঞ্জস্য ও সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে। এর ভুরি ভুরি প্রমাণ দেয়া যেতে পারে। একটি আয়াতের শব্দ প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করছি। সূরা বাকারার ১৮৮ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা নর ও নারীর সম্পর্কে তুলে ধরতে গিয়ে বললেন–**হুন্নালিবাসুকুম ওয়া আনতুম লিবাসুল্লাহুন্না** (অর্থাৎ নারীরা) তোমাদের পোষাক আর তোমরা (অর্থাৎ নরেরা)

তাদের পোষাক। 'লিবাস' শব্দের ব্যবহার নিয়ে প্রাচ্যবিদ লেখকরা কুরআন করীমের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু 'লিবাস' বা পোষাক পরিচ্ছদ যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় যেমন শীতাতপ থেকে আত্মরক্ষা করা, সৌন্দর্য বর্ধন করা এবং লজ্জা নিবারণ করা তেমনই নর ও নারী পরস্পরে বিয়েশাদীর মাধ্যমে প্রেম ও ভালবাসার উষ্ণতা ও মায়া মমতার বিকাশ ঘটায়, একে অপরের মাধ্যমে লজ্জা ও মান সম্ভ্রম সংরক্ষিত হয়। আর একে অপরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণও ঘটায়। অতএব এখানে 'লিবাস' শব্দটির প্রয়োগে খুব চমৎকারভাবে নর ও নারী তথা স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধুর সম্পর্ক সঠিক ও সার্থকভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। অন্য কোন শব্দের মাধ্যমে বিষয়টি এত সুন্দর ভাবে ফুটে উঠতো না। এ সবই মহান আল্লাহ্‌র মহিমা ও সৃষ্টি শৈলীর মহান নিদর্শন।

আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র গুণাবলীর সঠিক বর্ণনা

আল কুরআনের মত অন্য কোন ঐশী গ্রন্থ এত সুন্দরভাবে আল্লাহ্ তাআলার সিফাত বা গুণবাচক নামগুলো বর্ণনা করেনি। আল্লাহ্ তাআলা নিরাকার। তাঁকে চিনতে হলে তাঁর গুণাবলীর জ্যোতির্বিকাশের মাধ্যমেই চিনা সম্ভব। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা প্রায় শতাধিক সিফ্‌ত বা গুণবাচক নামের উল্লেখ করেছেন। এসব নাম বড়ই মাহাত্মপূর্ণ। কুরআন করীমের বৈশিষ্ট্য এই, এ পবিত্র নাম–আসমাউল হুসন-া–সুন্দরতম নামগুলোর মাঝে কোন বিরোধ বা বৈপরিত্য নেই। এঁরা একটি অপরটির পরিপূরক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ্ তাআলা মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। তিনি বিচার দিবসের কেবল বিচারক নন, বিচার দিবসের কর্তা বা মালিক। পার্থিব বিচারক সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর নির্ভর করে বিচার করেন। তার জন্য সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু বিচার দিনের যিনি মালিক বা কর্তা তিনি যাকে খুশী শাস্তি দিতে পারেন আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন (হে আল্লাহ্! আমরা তোমার ক্ষমারই প্রত্যাশী)। তবে কি তিনি স্বেচ্ছাচারী? না তিনি স্বেচ্ছাচারী নন। তিনি আলেমুল গায়েব বিধায় সব অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞতা। তাই তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে বিচার করেন। আর পার্থিব বিচারকের জ্ঞান সীমাবদ্ধ বিধায় সীমার মাঝে থেকেই বিচার করেন। যাকে ইচ্ছা শাস্তি বা অব্যাহতি দিতে পারেন না। মোট কথা আল্লাহ্ তাআলার এসব গুণের মাঝে কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি, এবং বিরোধ এবং বৈপরিত্য নেই বরং সবগুলোর মাঝে সুশৃঙ্খল ও সুসামঞ্জস্য রয়েছে। আরও উদাহরণ দিয়ে এটা প্রমাণ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "মোট কথা ঐশী গুণাবলীর বিভিন্ন বিভাগের যে পারস্পরিক সম্পর্ক–কুরআন করীমে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু তওরাত বিভাগগুলোর উল্লেখ তো করেছে কিন্তু এদের পারস্পরিক সম্পর্কের উল্লেখ করেনি। এর কারণে ভক্ত এথেকে পূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। আর এটা কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ" (ইনকিলাবে হাকীকী)।

আমাদের প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়** (বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলুল কুরআন)। কুরআন করীমের আদেশ নিষেধ অনুযায়ী সত্যিকারভাবে আমল করলে স্বল্প সময়ে এটা মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নত স্তরে পৌঁছে দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে যুগ ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন, **"সকল প্রকার কল্যাণ কুরআনে নিহিত আছে। বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় যদি না থাকে তাহলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মাঝে মানুষকে পবিত্র করতে সক্ষম। তোমরা কুরআন শরীফ থেকে যদি বিমুখ না হও তাহলে এ কুরআন তোমাদেরকে নবী সদৃশ করতে পারে"** (কিশতিয়ে নূহ্)।

আল কুরআনের মর্যাদা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রবন্ধের ইতি টানছি ঃ

"কুরআন শরীফ হচ্ছে সেই গ্রন্থ, যা এর নিজের মাহাত্ম্য, নিজের জ্ঞান প্রজ্ঞা, নিজের সত্যতা, নিজের রচনা শৈলীর সৌন্দর্য, শব্দ চয়ন, স্টাইল এবং নিজের আধ্যাত্মিক আলোরাশি সম্পর্কে নিজেই দাবী করছে আর সেই সাথে নিজের অতুলনীয় হওয়ার কথা নিজেই প্রকাশ করছে" (বারাহীনে আহমদীয়া, পৃষ্ঠা ৬৪০, ৬৪৩ পাদটীকা ১১)।

মহাগ্রন্থ কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব যুগে যুগে প্রমাণিত হতে থাকবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এ কুরআনের জ্যোতিতে ভরপুর হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

দিল মেঁ এহি হ্যা হার দম তেরা সহীফা চুমূঁ

কুরআঁ কে গিরদ খুমূঁ কা'বা মেরা এহি হ্যা ॥

(অন্তরে সদা এটাই, তব কিতাব চুম্বন করি

কুরআনের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করি কা'বা মোর এটাই)

–দুররে সামীন

খাতামুন্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)

মাহমুদ আহমদ সুমন

আমাদের প্রিয় নবী সারওয়ারে কায়েনাত, সাইয়েদুল মুরসালীন, খাতামুন্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)কে খোদা তাআলা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে সারা বিশ্বের কল্যাণের জন্য। হযরত রসূল করীম (সা.) যে যামানায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই যামানার অবস্থা সবারই কম বেশি জানা। আর আমরা যদি সেই যামানার প্রেক্ষাপটকে সামনে রাখি তাহলেই হযরত রসূল করীম (সা.)-এর জীবনের ঘটনাবলীর তাৎপর্য সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করতে পারবো। তিনি (সা.) মক্কা মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর (সা.) পিতার নাম আব্দুল্লাহ আর মাতার নাম আমেনা। হযরত রসূল করীম (সা.) এর জন্ম হয়েছিল সৌর হিসাব মতে ৫৭০ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে। তাঁর (সা.) জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয়েছিল 'মুহাম্মদ' যার অর্থ হচ্ছে, প্রশংসা করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রশংসিত। যে সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে সময়ের সমস্ত লোক সামান্য কিছু সংখ্যকবাদে মোশরেক বা অংশীবাদী ছিল। ঐ সমস্ত লোক নিজেদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আ.) -এর বংশধর বলে দাবী করতো। এবং বিশ্বাস করতো যে, ইব্রাহীম (আ.) মোশরেক বা অংশীবাদী ছিলেন না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা শিরক বা অংশীবাদিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এবং সেজন্য তারা এই যুক্তিও দেখাত যে, কোন কোন মানুষ উন্নতি করতে করতে খোদা তাআলার এরূপ নৈকট্য উপনীত হন যে, তাঁদের সাফায়াত বা সুপারিশ খোদা তাআলার দরগাহে নিশ্চিতরূপে গৃহীত হয়ে যায়। এবং যেহেতু খোদা তাআলার সত্তা অতিশয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। সেহেতু সব মানুষের পক্ষে তথায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয়। কেবলমাত্র কামেল ইনসান বা পূর্ণমানবই সেখানে পৌছাতে পারেন। এ কারণেই যে কোন সাধারণ মানুষের জন্য এটা জরুরী যে, সে যেন কোন না কোন উছিলা বা মাধ্যম অবলম্বন করে এবং সেই উছিলার কল্যাণে খোদা তাআলার সন্তুষ্টি ও সাহায্য লাভ করে। এই আজগুবী ও নিকৃষ্ট বিশ্বাসের দরুণ তারা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে একত্ববাদী মানার পরেও নিজেদের জন্য শিরক বা অংশীবাদিতাকে একটা অবলম্বন হিসেবে তৈরী করে নিয়েছিল। ইব্রাহীম (আ.) ছিলেন অতীব পবিত্র। তিনি খোদার সমীপে সরাসরি পৌঁছে যেতে পারতেন। কিন্তু মক্কার লোকেরা তো সেই মর্যাদার অধিকারী ছিলনা। কাজেই তারা বড় বড় মানুষকে উছিলা বানাবার প্রয়োজন বোধ করতো। তাই প্রয়োজনের তাগিদে তারা সেইসব মানুষের বা তাদের নামে তৈরী মূর্তিগুলোর ইবাদত বা পূজো করতো। এবং এভাবেই নিজেদের ধারণা অনুযায়ী তাদেরকে সুখী করে খোদা তাআলার দরবারে তাদেরকে নিজেদের জন্য উছিলা বানিয়ে নিত। এই আকিদা বা ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে যে নানা প্রকার ক্ষতিকর বিষয় ও বহু ফাঁক-ফোঁকর রয়ে গেছে সেগুলির প্রতি তাদের দৃষ্টি কখনই নিবদ্ধ হতো না। কেননা, তারা কখনও একত্ববাদী শিক্ষাদাতা পায়নি। যখন কোন জাতির মধ্যে শিরক শুরু হয়ে যায়, তখন তা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। একটা থেকে দু'টো, দু'টো থেকে তিনটা এভাবে বাড়তেই থাকে। তাই মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মের সময়ে কা'বা ঘরের ভিতরে (যা কিনা এখন মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ এবং হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর নির্মিত ইবাদত গৃহ) ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে তিনশ' ষাটটি মূর্তি ছিল। অর্থাৎ চান্দ্র মাসগুলোর হিসেবে প্রতিদিনের জন্যই ছিল একটা করে মূর্তি। এইসব মূর্তি ছাড়াও আশেপাশের এলাকাগুলোতে বড় বড় গঞ্জে বন্দরে, এবং বড় বড় গোত্র বা কঠিলাগুলোর কেন্দ্রে কেন্দ্রেও পৃথক পৃথক মূর্তি ছিল। এক কথায় আরবের প্রত্যেকটি এলাকা শিরক বা অংশীবাদিতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

আরবের লোকেরা বাকভঙ্গীর চর্চা ও উন্নতির দিকে বিশেষ মনোযোগী ছিল। তারা তাদের ভাষাকে, কথা বলার ষ্টাইলকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালাতো। কিন্তু, এই বিষয়টি ছাড়া ওদের কাছে অন্য আর কোন জ্ঞান আহরণের কোন সার্থকতাই ছিল না। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি বিষয়ের কোন একটিতেও তারা কোন জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করতো না। তবে, তারা জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞানে অনেকটা পারদর্শী ছিল। কেননা, মরুভূমির মধ্যে তাদেরকে চলাচল করতে হতো। সেখানে কোন মাইল ফলক ও কোন দিক নির্দেশক চিত্র ছিলনা। কাজেই, মরুভূমিতে ভ্রমণ করার সময় তাদেরকে জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হতো। সারা আরবে একটিও মাদ্রাসা ছিল না। বলা হয় যে, মক্কা মুকাররমাতেও মাত্র কয়েকজন লোক লিখতে পড়তে পারতো। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আরব ছিল একটি পরস্পর বিরোধী গুণাবলী বিশিষ্ট জাতি। তাদের মধ্যে বহু মারাত্মক পাপের প্রচলন ছিল। তবু এমন কিছু পুণ্য কাজও তারা করতো যা তাদের জাতীয় মানদণ্ডকে বেশ কিছুটা উন্নত রাখতে পেরেছিল। মদের সাংঘাতিক আসক্ত ছিল আরবরা। মদের নেশায় বেহুঁশ হওয়া কিংবা মাতলামী করা তাদের নিকটে কোন দোষণীয় ব্যাপারই ছিল না। বরং তা প্রশংসার ব্যাপার ছিল। কোন অভিজাত ব্যক্তির আভিজাত্যের

চিত্রসমূহের মধ্যে এই চিত্র থাকারও প্রয়োজন ছিল যে, তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া প্রতিবেশীদেরকে জোর করে মদ খাওয়াবেন। ধনী ব্যক্তিদের জন্য জরুরী ছিল, দিনে পাঁচবার মদের আসর বসানো। এবং এই ধরনের আসর ছিল তাদের জাতীয় ক্রীড়া। এটাকে তারা একটা ফাইন আর্ট বানিয়ে নিয়েছিল। তারা জুয়া খেলতো। কিন্তু এজন্য খেলতো না যে, এতে তাদের মাল সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। জুয়া খেলাকে তারা বদান্যতা ও গৌরবের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। জুয়াড়ীদের মধ্যে এই অঙ্গীকার হতো যে, যে ব্যক্তি জিতবে সে তার জিতের মাল থেকে তার বন্ধু-বান্ধব ও গোত্রীয় লোকদের দাওয়াত খাওয়াবে। যুদ্ধের সময় তারা জুয়ার মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা সংগ্রহ করতো। যুদ্ধ চলাকালে আজকের দিনেও লটারী করার রেওয়াজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই যুগে নারীদের কোন অধিকার ছিলনা। কোন কোন কবিলার মধ্যে পিতা কর্তৃক আপন কন্যাকে হত্যা করাটা সম্মানের বিষয় ছিল। সেই যুগে দাস প্রথা একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। তারা আশপাশের গোত্রের লোকজন ধরে এনে গোলাম বানিয়ে রাখতো। গোলামদের কোন হক বা অধিকার ছিল না। প্রত্যেক মালিক তার গোলামের সাথে যেমন খুশী ব্যবহার করতো। এতে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা ছিলনা। এমনকি হত্যা করলেও কেউ কোন অভিযোগের সম্মুখীন হতো না। কেউ অপর কোন ব্যক্তির গোলামকে হত্যা করলেও তার প্রতি মৃত্যুদন্ড প্রযোজ্য হতো না। হত্যাকারী নিহত গোলামের মালিককে কিছু খেসারত দিলেই মুক্ত হয়ে যেতে। দাসীদের সহিত যৌনাচার মালিকদের জন্য বৈধ বলে স্বীকার করা হতো। দাসীদের সন্তানরাও গোলামরূপে গণ্য হতো। নিজের ঔরসজাত সন্তানের মা হলেও দাসী দাসীই থাকতো।

উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে জন্ম গ্রহণ করেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। তাঁর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ মারা যান। তাঁকে এবং তাঁর মা আমিনাকে তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব গ্রহণ করেন আপন অভিভাবকত্বে। আরবের প্রথা অনুযায়ী তাঁকে দুধ খাওয়ানোর জন্য তায়েফের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী জনৈক স্ত্রীলোকের কাছে দেওয়া হয়। আরবরা নিজেদের বাচ্চাদেরকে গ্রামের স্ত্রীলোকদের কাছে দিয়ে দিতো, যাতে বাচ্চারা ভালভাবে কথা শিখতে পারে এবং তাদের স্বাস্থ্য ভাল হয় ও সুন্দর হয়। তাঁর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর মা মদীনার আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী থেকে তাঁকে নিয়ে ফেরার সময় মাঝ পথে মারা যান। এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন। তাঁকে মক্কায় ফিরে নিয়ে আসে এক দাসী, যে তাঁকে তাঁর দাদার হাতে তুলে দেন। তাঁর বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর লালন-পালনকারী দাদাও মারা যান। অতঃপর তাঁর চাচা আবু তালিব স্বীয় পিতার ওসীয়্যাত অনুসারে তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। দু'তিনবার আরবের বাইরে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। এর মধ্যে একবার তিনি (সা.) বার বছর বয়সে চাচা আবু তালিবের সঙ্গে এক বাণিজ্য সফরে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রকৃতিতে চিন্তা ভাবনা করার বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হতো। মানুষের লড়াই ঝগড়ার মধ্যে তিনি কখনও নিজেকে জড়াতেন না। বরং লড়াই ও কলহ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টাই করতেন তিনি। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স যখন পঁচিশ বছর, তখন তাঁর সৎকাজের কথা এবং তাঁর খোদা প্রেম ও খোদাভীতির কথা সর্ব সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়লো। লোকজন তাঁর দিকে আঙ্গুল তুলে দেখাতো এবং বলতো দেখ! ঐ একজন সৎ মানুষ যাচ্ছেন, একজন আমানতদার যাচ্ছেন। এই সকল কথা মক্কার একজন সম্পদশালী মহিলার কানেও পৌঁছে গেল। তিনি চাচা আবু তালিবের কাছে বলে পাঠালেন যে, তিনি যেন তাঁর ভাতিজা মুহাম্মদকে বলেন যে, তার যে সমস্ত মালামাল সিরিয়ার বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে যাচ্ছে, তিনি যেন তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আবু তালিব বিষয়টি তাঁর (সা.)কাছে বলেন, তিনি রাজি হয়ে গেলেন। এই বাণিজ্য সফরে তিনি যথেষ্ট সফলতা লাভ করলেন এবং আশাতিরিক্ত মুনাফা করে ফিরে এলেন। খাদীজা (রাঃ) বুঝতে পারলেন যে, এত বেশী মুনাফা শুধু বাজারের অনুকূল অবস্থার জন্যে সম্ভব হয়নি। বরং তা সম্ভব হয়েছে বাণিজ্য কাফেলার নেতার সততা ও দক্ষতার কারণে। তিনি তাঁর গোলাম মাইমরাকে, যে ঐ বাণিজ্য সফরে আঁ হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গী ছিল, বিষয়টা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সেও তাঁর ধারণাকেই সমর্থন করলো এবং বললো যে, এই সফরে যেরূপ সততা, দক্ষতা ও সদাচরণের সঙ্গে তিনি তার দায়িত্ব পালন করেছেন, সে কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। ব্যাপারটা হযরত খাদিজার উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করলো। যদিও তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০ (চল্লিশ) বছর এবং তিনি দু'বার বিধবা হয়েছিলেন। তবু তিনি তাঁর এক বান্ধবীকে পাঠিয়ে ছিলেন এইকথা জানার জন্য যে, তিনি (সা.)তাঁকে বিবাহ করতে রাজি হবেন কিনা। সেই বান্ধবী তাঁর নিকটে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি বিবাহ করছেন না কেন। তিনি বললেন, আমার তো তেমন কোন সহায় সম্পত্তি নেই, আমি বিয়ে করবো কিভাবে? বান্ধবীটি বললেন, সেই অসুবিধা যদি দূর হয়ে যায়, তাহলে? তিনি বললেন, আমি কি এতটা আশা করতে পারি? বান্ধবীটি বললেন, সেটা আপনি আমার উপর ছেড়ে দিতে পারেন। তিনি বললেন, তেমন হলে

আমি রাজি আছি। অতঃপর খাদিজা (রা.) তাঁর চাচার মধ্যস্থতায় বিয়ের কথা পাকাপাকি করে ফেলেন এবং তাঁদের বিয়ে হয়ে যায়। একজন গরীব ও এতিম যুবকের জন্য প্রথমবারের মত সম্পদের দুয়ার খুলে গেল। কিন্তু, সেই সম্পদের ব্যবহার তিনি যেভাবে করেছিলেন তা সারা পৃথিবীর জন্য একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

হযরত রসূল করীম (সা.)-এর বিবাহের পর হযরত খাদীজা (রা.) মনে মনে চিন্তা করলেন যে, আঁ হযরত (সা.)এইভাবে সুখী নাও হতে পারেন যে, তাঁর স্ত্রী একজন বিত্তশালী মহিলা আর তিনি নিজে তারই মুখাপেক্ষী। তাই তিনি রসূলকরীম (সা.)-এর কাছে বললেন, 'আমি নিজের সব মাল সম্পদ ও গোলাম আপনার খেদমতে পেশ করতে চাচ্ছি।' তিনি (সা.)বললেন, 'খাদীজা, এটা তুমি সত্যি সত্যিই বলছ?' খাদীজা (রা.) বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই বলছি।' তখন রসূলকরীম (সা.)বললেন, 'তাহলে আমার প্রথম কাজ এটাই হবে যে, আমি সকল গোলামকে মুক্তি দিয়ে দিব।' তিনি তখনই, হযরত খাদীজার (রা.) গোলামদেরকে ডেকে আনলেন এবং তাদেরকে বললেন 'তোমরা সবাই আজ থেকে মুক্ত।' অতঃপর তিনি মাল সম্পদের অধিকাংশই গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

হযরত রসূলকরীম (সা.)-এর বয়স যখন ত্রিশ বছর পার হলো তখন তাঁর হৃদয়ে আল্লাহর ইবাদত করার প্রেরণা পূর্বের চাইতে বেশী হতে লাগলো। শহরবাসীদের দুস্কৃতি, খারাপী ও বদকাজের প্রতি বিরূপ হয়ে তিনি অবশেষে মক্কা থেকে ২/৩ মাইল দূরের এক পাহাড়ে আল্লাহর ইবাদতের জন্য একটা স্থান করে নিলেন। জায়গাটা ছিল পাহাড়ের উপরের দিকে পাথর ঘেরা ছোট্ট একটি গুহা। হযরত খাদীজা (রা.) এক সঙ্গে কয়েকদিনের খাদ্য তৈরী করে দিতেন। সেই খাদ্য নিয়ে তিনি হেরা গুহার ভিতরে চলে যেতেন। এবং সেখানে পাথরের মধ্যে বসে তিনি দিন-রাত আল্লাহ তাআলার ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন।

হযরত রসূল করীম (সা.)-এর বয়স যখন চল্লিশ বছর হলো, তখন একদিন তিনি ঐ হেরা গুহার মধ্যে এক কাশফে (দিব্যদৃষ্টিতে) দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি তাকে সম্বোধন করে বলছেন যে, 'পড়ুন'। তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।' এতে সেই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার সেই কথা বললেন, তৃতীয়বার বললেন।... তিনি তাঁকে পাঁচটি কথা বলায়ে ছাড়লেন : **"ইকরা বিসমি রাব্বি কাল্লাযি খালাক, খালাকাল ইনসানা মিন আলাক, ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম, আল্লাযি আল্লামা বিল কালাম, আল্লামাল ইনসানা মালাম ইয়ালাম"** অর্থাৎ 'তুমি পাঠ কর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন ইনসানকে (মানুষকে) এক আঁঠাল-জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। তুমি পাঠ কর, কেননা তোমার প্রভু-প্রতিপালক পরম সম্মানিত যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন ইনসানকে তা-ই যা সে জানতো না। (সূরা আল আলাক আয়াত-২-৬)

এই ছিল সেই প্রথম কোরআনী ওহী (ঐশীবাণী) যা অবতীর্ণ হয়েছিল মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপরে। তিনি এ ঐশীবাণী লাভের পর হযরত খাদীজার (রা.) কাছে এলেন। তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। তিনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। হযরত খাদীজা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে'? তিনি পুরো ঘটনার বর্ণনা দিলেন এবং বললেন, 'আমার মত দূর্বল মানুষ এত বড় বোঝা কেমন করে বইবে?' হযরত খাদীজা (রা.) বললেন, 'খোদার কসম!' এই বাণী খোদা তাআলা আপনার উপর এ জন্য নাযিল করেন নি যে, তিনি আপনাকে অযোগ্য ও অকৃতকার্য প্রমাণিত করবেন এবং আপনার সঙ্গ ছেড়ে দিবেন। খোদা কি কখনও এমন করতে পারেন? আপনি তো সেই ব্যক্তি যিনি আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে উত্তম আচরণ করেন, গরীব ও অসহায় ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করেন তাদের বোঝা নিজে বহন করেন। যে চরিত্রগুণ এদেশ থেকে উঠে গেছে তা সবই আপনার মাধ্যমে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আপনি অতিথির সেবাকারী, দুঃখী মানুষের সহায়তাকারী। এই রকম মানুষকে কি খোদা তাআলা কখনও পরীক্ষার মধ্যে ফেলে রাখতে পারেন?

অতঃপর, তিনি (রা.) তাঁর চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফেলের কাছে তাঁকে (সা.) নিয়ে গেলেন। ওরাকা ছিলেন খ্রীষ্টান। তিনি যখন এই ঘটনার কথা শুনলেন তখন সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, আপনার উপরে সেই ফেরেশতাই নাযিল হয়েছে যে নাযিল হয়েছিল মুসার উপরে। (বোখারী : বাবু, বা'দাল ওহী)। যখন এই খবর তাঁর মুক্ত করে দেওয়া গোলাম যায়েদ (তখন বয়স পঁচিশ/তিরিশ বছর) এবং তাঁর চাচাতো ভাই আলী'র কাছে পৌঁছল তখন তারা উভয়েই তাঁর (সা.)উপরে ঈমান আনলেন।

এই ছিল সেই ছোট্ট জামাত, যার উপরে স্থাপিত হয়েছিল ইসলামের বুনিয়াদ। একজন মহিলা যিনি প্রায় বার্ধক্যে উপনীত, একজন এগারো বছরের বালক, একজন মুক্তিপ্রাপ্ত যুবক গোলাম, এবং একজন বন্ধু আর সেই ওহী (ঐশীবাণী) লাভের দাবীদার এই ছিল সেই ছোট্ট কাফেলা যা দুনিয়াতে আলো ছড়াবার জন্য কুফরী ও অন্ধকারের প্রান্তরে ধাবিত হলো। লোকেরা যখন এইকথা শুনলো তখন তারা হাসি-তামাশা করতে লাগলো, একে অপরকে চোখ টিপে বলতে লাগলো, এই লোকগুলো পাগল হয়ে গেছে। ওদের

কথায় কান দিওনা। তবে শুনতে চাইলে শুনতে পারো মজা করার জন্য। কিন্তু সত্য তখন তার পূর্ণ মর্যাদাসহ প্রকাশিত হতে শুরু করলো। একদিক দিয়ে বিরোধীতা প্রবল আকার ধারণ করলো অপরদিকে মুসলমানদের দলও ভারী হতে থাকলো। বিরোধিতা বেড়েই চললো। একই সঙ্গে রসূলকরীম (সা.)এবং সাহাবীগণও (রা.) মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছাতে থাকলেন এই বাণী ঃ "বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা খোদা এক, তিনি ছাড়া কোন মাবূদ (উপাস্য) নেই। যত নবী ইতোপূর্বে গত হয়ে গেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর তওহীদ বা একত্বেরই প্রচার করে গেছেন। এবং তাঁরা এই শিক্ষাই দিতেন তাদের স্ব স্ব জাতিকে। তোমরাও এক খোদার প্রতি ঈমান আনো। এই পাথরের প্রতিমাগুলোকে পরিত্যাগ করো। এগুলো সব নিস্প্রাণ এবং এগুলোর কোন শক্তি নেই।"

'হে মক্কাবাসীরা! তোমরা কি দেখতে পাওনা যে, ওগুলোর সামনে যে নযর নেওয়াজ বা নৈবদ্য রাখা হয়, সেগুলির উপরে যদি মাছিও বসে, তবে সেই মাছি তাড়াবার শক্তিও ওদের নেই? কিংবা যদি কেউ ওদের উপরে হামলা করে তাহলে ওরা নিজেদেরকে রক্ষা করতেও পারে না? কেউ যদি ওদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করে, তাহলে তার উত্তর দিতেও পারে না? কেউ যদি ওদের কাছে কিছু সাহায্য চায়, তবে ওরা তাকে সাহায্য করতেও পারে না?'

পক্ষান্তরে এক আল্লাহ তো প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা পূর্ণ করেন, প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দেন। সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য করেন। এবং নিজের উপাসনাকারী বান্দাদেরকে বড় বড় সাফল্য দান করেন। তাঁর থেকেই আলো আসে, যে আলো তাঁর ইবাদতকারীদের হৃদয় আলোকিত করে। এরপরও কেন তোমরা এমন খোদাকে ছেড়ে নিস্প্রাণ মূর্তিগুলোর সামনে মাথানত কর? এবং কেন নিজেদের সারাটা জীবনকে নষ্ট করে ফেলো? তোমরা কি দেখতে পাওনা যে খোদা তাআলার তৌহীদ ছেড়ে দেওয়াতে তোমাদের ধ্যান-ধারণা কলুষিত হয়ে গেছে? হৃদয় অন্ধকার হয়ে গেছে? তোমরা নানা প্রকার বিকৃত শিক্ষা ও সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছ? তোমরা হালাল হারামের মধ্যে কোন বাছ-বিচার করতে পার না? ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পার না? নিজেদের মায়েদের পর্যন্ত লাঞ্ছিত কর? নিজেদের বোন-ভাইদের উপরও অত্যাচার কর? তাদের হক তাদেরকে দাও না? তাদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখ? নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গেও তোমরা ভাল আচরণ করনা? তোমরা এতিমদেরও হক মেরে খাও? বিধবাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কর? অপরের হক মেরে নিজেদের বড়াই বজায় রাখতে চাও? মিথ্যা ও প্রতারণার প্রতি তোমাদের ঘৃণা নেই? চুরি ও ডাকাতির প্রতি তোমাদের ঘৃণা নেই? জুয়া ও শরাব হচ্ছে তোমাদের নেশা? বিদ্যা অর্জন ও জাতির সেবার প্রতি তোমাদের কোন খেয়াল নেই? এক আল্লাহ থেকে আর কতদিন তোমরা গাফেল থাকবে?

'আস! এবং নিজেদের সংশোধন কর। বর্বরতা ছেড়ে দাও। প্রত্যেক হকদারকে তার হক দাও। খোদা যদি তোমাদের ধনসম্পদ দিয়ে থাকেন, তাহলে তা দেশ ও জাতির খেদমতে এবং দুর্বল দরিদ্রদের উন্নতির জন্য খরচ কর। নারীদেরকে সম্মান কর। এবং তাদের হক আদায় কর। এতীমদেরকে আল্লাহর আমানত মনে কর। তাদের দেখাশুনা করাকে মহাপুণ্যের কাজ বলে স্বীকার কর। বিধবাদের সাহায্য করাকে মহাপুণ্যের কাজ বলে স্বীকার কর এবং বিধবাদের সাহায্য সহায়তা কর। পুণ্য কাজ ও খোদা-ভীতি কায়েম কর। শুধু ইনসাফ ও ন্যায় পরায়ণতা নয় বরং সে সঙ্গে দয়া ও উপকারকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত কর। এই দুনিয়াতে তোমাদের আগমন যেন বৃথা না যায়। উৎকৃষ্ট আদর্শ রেখে যাও, যেন চিরস্থায়ী পুণ্যকাজের বীজ বপন করা হয়। অধিকার আদায় করাতে নয়, বরং কুরবানী ও স্বার্থত্যাগ করার মধ্যেই আসল মর্যাদা নিহিত। অতএব, তোমরা কুরবাণী কর। খোদার নৈকট্যে উপনীত হও। খোদার বান্দাদের মোকাবেলায় স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন কর, যাতে খোদা তাআলার দরবারে তোমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।'

'সন্দেহ নেই যে, আমরা দুর্বল। কিন্তু আমাদের দুর্বলতা দেখিওনা। আসমানের উপর সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে সত্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার। এখন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে ন্যায়ের তুলাদন্ড তুলে ধরা হবে। এবং ইনসাফ ও রহমতের শাসন কায়েম করা হবে। ফলে, কারো উপরে আর জুলুম হবে না। ধর্মের ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ থাকবে না, জবরদস্তি থাকবে না। নারী ও ক্রীতদাসের প্রতি যে জুলুম করা হচ্ছে, তা শেষ করা হবে। এবং শয়তানের হুকুমতের স্থলে এক আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে।

এরপর জুলুম অত্যাচারের সীমাও বেড়ে যেতে লাগলো, হিজরত করতে বাধ্য হলেন, একদিকে অত্যাচার অন্যদিকে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলেন। মুসলমানদের একের পর এক বিজয় হতে লাগলো। মদীনার পৌত্তলিকরাও ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে মুসলমানদের অন্ধকার রজনী কেটে গেল, উদ্বিত হলো নতুন সূর্যের মক্কা মুসলমানদের অধীনে চলে আসলো। অল্পদিনের মধ্যেই সারা আরবে ইসলামী পতাকা পত্ পত্ করে উড়তে থাকলো।

[হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) কতৃক রচিত 'নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)' পুস্তক অবলম্বনে।]

এমন একদিন ছিল যেদিন পৃথিবীর এক দেশ আরেক দেশ সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল। এক জাতি অপর জাতি সম্বন্ধে অজানা ছিল। তাদের মধ্যে যোগাযোগ এবং হাবভাব আদান প্রদানের কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। যারা যে দেশে বাস করতো, সেই দেশটাকেই তারা গোটা পৃথিবী বলে ধারণা করতো। তাদের দেশের বাইরে অন্য কোন দেশ আছে বলে কল্পনাও করতে পারতো না। এরূপ ধারণার কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। সেই সময় বিশ্ব স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন নবী রসূল বা অবতার প্রেরণ করেছেন। পাক কালামে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে এক এক জন নবী প্রেরণ করে এই বার্তা দিয়েছি যে, আল্লাহ্‌র উপাসনা কর এবং ভ্রান্ত পথ ত্যাগ কর।" প্রত্যেক জাতির জন্য একজন রসূল ছিলেন (সুরা ইউনুস) "প্রত্যেক জাতির জন্য একজন পথ প্রদর্শক ছিলেন" (সূরা রাদ) এমন কোন জাতি নেই যাদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ না করেছি।" (সূরা ফাতের)। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তোমার পূর্বে আমরা অসংখ্য নবী প্রেরণ করেছি, তন্মধ্যে কতক নবীদের নাম তোমার নিকট উল্লেখ করেছি এবং কতক নবীর নাম তোমার কাছে উল্লেখ করি নাই, (সূরা মোমেন)। "(হে মুহাম্মদ) সিত্যকারের বিশ্বাসী যারা, তারা তোমার প্রতি যে বাণী অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যে সকল বাণী অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে, (সূরা বাকারা)।

মানুষের মঙ্গল ও মুক্তির জন্য আল্লাহ্ তাআলা সকল দেশে সকল জাতির নিকট বিভিন্ন সময়ে নবী রসূল প্রেরণ করেছেন। তাদের কর্মক্ষেত্র ছিল একটা দেশের একটা জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ কুরআন অনুসারে তাদের প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু সেকালে কোন ধর্মই পূর্ণতম ধর্ম ছিল না। তাদের ধর্মের কোন নাম ছিল না। যেমন যীশু খ্রিষ্টের অনুসারীগণকে যীশু খ্রিষ্টের নামানুসারে খ্রিষ্টান বলা হয়। সিন্ধু নদের

শেষ নবী

সরফরাজ এম, এ সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

উৎপত্তি স্থলের নামানুসারে হিন্দু সম্প্রদায়কে হিন্দু বা ইন্দু বলা হয়। গৌতম বুদ্ধের নামানুসারে বুদ্ধদেবের অনুসারীগণকে বৌদ্ধ বলা হয়। অর্থাৎ তাদের কোন পরিপূর্ণ ধর্মীয় বিধান ছিল না। অতঃপর এক দেশের মানুষ যখন আরেক দেশের মানুষ সম্পর্কে জানতে বুঝতে শিখালো। যানবাহন ইত্যাদিতে মানুষের যোগাযোগ এবং হাবভাব আদান প্রদানের সুযোগ সুবিধা হলো সেই সময়ে সমগ্র বিশ্ব মানবের মুক্তি ও শান্তির বাণী নিয়ে আগমন করলেন বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)। তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন। সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ্ তাআলার রহমত, জাতিগত ধর্মের সকল সংকীর্ণ গন্ডী চিরকালের তরে তুলে দিয়ে বিশ্ব মানবের সকল প্রকারের বাঁধা ব্যবধানের মূলে কুঠারাঘাত করে সকল দেশের সকল জাতির সকল মানুষকে একত্র ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে সমগ্র বিশ্ববাসীকে একই ইসলাম বা শান্তির পতাকাতলে এনে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র উপাসনা দ্বারা জগতে স্বর্গীয় শান্তি, সুখের আবাসস্থলে পরিণত করার অপূর্ব সুযোগ করে দিলেন। তিনি আগমন করলেন পূর্ণতম ধর্মীয় বিধান নিয়ে যার নাম ইসলাম বা শান্তি। ইসলামের অনুসারীগণকে বলা হয় মুসলমান।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "অদ্য তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে সম্পূর্ণ করলাম তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহকে পূর্ণভাবে প্রদান করলাম এবং ধর্ম হিসাবে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করলাম"। (সূরা আম্বিয়া) "আমরা তোমাকে সুসংবাদ বহনকারী ও সতর্ককারী করেই সমগ্র মানবমন্ডলীর নিকট প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানব তা জানে না"।

মানবকূল শ্রেষ্ঠ হযরত রসূল করীম (সা.) আরব পারস্য বা বাংলাদেশ পাকিস্তান অথবা কোন জাতি কিংবা কোন দলের একচেটিয়া নবী নহেন। তিনি সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য নবী।

প্রচার শক্তিই ধর্মের প্রাণ। যে ধর্মের প্রচার কার্য নেই সে ধর্ম প্রাণহীন দেহের তুল্য। ইসলাম প্রচারমূলক ধর্ম। প্রচার ব্যতীত বিশ্বজনীন বার্তা বিশ্ব মানবকে পৌঁছান যায় না। প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, জনসংখ্যার দিক দিয়ে বর্তমান বিশ্বে এক চতুর্থাংশ মুসলমান, বাকী সবই অমুসলমান। তাদের নিকট ইসলামের সুমহান বাণী পৌঁছিয়ে বর্তমানকালে অমুসলমানদেরকে মুসলমান বানায় কে বা কারা? বিশ্ব নবী হযরত রসূল করীম (সা.) এর ইন্তেকালের পর এই গুরু দায়িত্ব ছিল নায়েবে রসূলের দাবিদার আলেম ওলামা ও মুফতি সাহেবানদের ওপর। দুনিয়াদারীর লোভ লালসায় মত্ত হয়ে নায়েবে রসূলের দাবীদারগণ ইসলামের চির শত্রু তিত্ববাদী দাজ্জালের পাতা ফাঁদে জড়িয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে মসনদ লাভের মোহে ইসলামের আদর্শ লাভের শিক্ষাকে দুরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অভ্যন্তরীণ মাজহাবী দ্বন্দ্ব কলহ ঝগড়া বিবাদ, হিংসা বিদ্বেষে লিপ্ত হয়ে, কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয় ইত্যাদি ফতওয়া দিয়ে ইসলামের খেদমত করতে করতেই তাদের সময় ফুরিয়ে যায়, অমুসলমানকে মুসলমান বানাবে কখন?

ইসলাম যেমন আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। রোজ কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর মনোনীত এই ধর্মীয় বিধানকে সক্রিয় রাখার ব্যবস্থা স্বয়ং তিনিই করেছেন। পাক কালামে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! যারা ঈমান এনেছ, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে মেনে চল আল্লাহকে, মেনে চল রসূলকে এবং তোমাদের মধ্যে যিনি আদেশ দেয়ার অধিকারী তাঁকেও"। (সূরা নেসা)। আদেশ দেওয়ার অধিকারী বলতে জাগতিক দিক দিয়ে রাষ্ট্র প্রধানকে বুঝায় এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যুগ ইমামকে বুঝায়। যুগ ইমাম নবী না হলেও একজন মানুষ যেভাবে নবীকে মান্য করে থাকে একই ভাবে যুগ ইমামকে মেনে চলতে হবে। তাই হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে না মেনে মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যু

জাহেলিয়াতের"। (মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল) যুগ ইমাম নবী রসূল মোজাদ্দেদ মোহাদ্দেস সকলকেই বুঝায়। প্রতি শতাব্দীর প্রারম্ভে একজন মোজাদ্দেদের আগমনের সম্পর্কে আলেম ওলেমাগণ তাদের বই পুস্তকে প্রচার করেছেন গুরুত্ব আরোপও করে গেছেন।

যেমন হযরত আখেরী নবী হওয়া সত্বেও আবশ্যক বোধে সংস্কারকের দ্বার বন্ধ করেন নাই। কেননা তিনি বলেছেন, "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে এমন একজন সংস্কারক প্রেরণ করবেন যিনি তাদের জন্য তাদের ধর্ম সংস্কার করতে পাারেন।" (আলহাজ্জ মাওলানা ফজলুল করীম, এম, এ, বি, এল রচিত মানব ধর্ম পৃঃ ৮৪) কিন্তু হযরত রসূল করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যুগ ইমামের কথা তাদের বই পুস্তকে স্বীকার করলেও অনেকেরই যুগ ইমামকে মেনে চলার সৌভাগ্য হয় না, বরং দুনিয়াবী স্বার্থে তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে কোমর বেঁধে লাগে।

পবিত্র কুরআন এবং হাদীস অনুযায়ী নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান জাতি, কখনো ইমাম বা নেতাবিহীন থাকতে পারে না। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তাআলা সকল সময় তাদের জন্য ইমাম বা নেতা সৃষ্টি করবেন। বিশ্ব নবী হযরত রসূল করীম (সা.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা শরীয়তকে পরিপূর্ণ করেছেন। মানব সামাজের চলার পথে খুটি নাটি এমন কোন বিষয় নেই যা তাতে উল্লেখ হয়নি। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, রাষ্ট্রগত সকল সমস্যার সুষ্ঠুভাবে পূর্ণ সমাধান রয়েছে তাতে। কোন সময় কোন কালে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন, সংযোগ ও বিয়োগ, কম বা বেশি হবে না। অর্থাৎ প্রয়োজন নেই মানব জীবনের চলার পথে যাবতীয় চাহিদা পূর্ণভাবে শেষ হয়ে গেছে। এই অর্থে হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সা.) শেষ নবী । কিন্তু তিনি পূর্ণতম শরিয়তধারী শেষ নবী হওয়া সত্বেও পাপের স্রোত শেষ হয়ে বা বন্ধ হয়ে যায় নি। বরং বর্তমান যুগে যে প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছে একথা কারও অজানা নেই। এই অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা মুহাম্মদ (সা.) এর অনুগমনে নবুওয়াতের দরজা খোলা রেখেছেন। তাই আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "হে বনী আদম সন্তানগণ! যদি তোমাদের মধ্যে হতে তোমাদের নিকট রসূলগণ আগমন করে এবং আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনায়, তখন যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করবে এবং সংশোধন করবে সেক্ষেত্রে তাদের জন্য না কোন ভয় থাকবে এবং না তারা দুঃখীত হবে।" (সূরা আ'রাফ) "নিশ্চয়ই আমার তরফ থেকে তোমাদের নিকট হেদায়াত আসবে। যারা আমার হেদায়ত অনুসরণ করবে, তাদের কোনই ভয় নাই এবং তারা দুঃখীত হবে না" (সূরা বাকারাহ)। হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমার উম্মতের আলেমগণ পূর্ববর্তী নবীগণের তুল্য।" বুঝা গেল যে মানবকুল শ্রেষ্ঠ রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত নবী করীম (সা.) শরীয়তধারী শেষ নবী। তাঁর পরে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাবে আর কোন নবী রসূলের আগমন হবে না। যিনি আগমন করবেন তিন নবী করীম (সা.) এর অনুগমনে সংস্কারক হিসাবে মুসলমান জাতির ইমাম বা নেতারূপে নায়েবে রসূল হিসেবে আগমন করবেন। যেমন আলেম ওলামাগণ নায়েবে রসূলের দাবিদার। তদ্রুপ তিনি নায়েবে রসূল। স্বাধীন স্বতন্ত্র নবী রসূল নহেন। বর্তমান যুগের নায়েবে রসূলের দাবীদারগণের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ্ এখন আর মানুষের সাথে কথা বলবেন না–অর্থাৎ ওহী ইলহাম এর দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তাআলা মানুষের সাথে পূর্বে কথা বলবেন এখন আর কথা বলবেন না। অথচ পাক কালামে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন বলো, আমি নিকটেই আছি, আমি প্রার্থনাকারীর উত্তর দিই, যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তারও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে, তবেই তারা সুপথ পাবে।" (বাকারাহ) "ওহী ব্যতীত আল্লাহ্ নশ্বর মানবের সাথে কথা বলেন না, অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা তিনি রসূল প্রেরণ করেন এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন তাও তার ওপর অবতীর্ণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি মহান ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা আশ্ শুরা) হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেছেন, "নবুওয়াতের দরজা ব্যতীত কেহ আল্লাহ্র ওলী হতে পারে না।" কিন্তু নায়েবে রসূলের দাবীদারগণ নবুওয়াতের দরজায় তালা লাগিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছেন মরে গিয়ে বেহেশতে কবে নাগাত কে কয়াটা হুরি গেলমান লাভ করবেন। প্রশ্ন এই যে, তাদের বিশ্বাসে খ্রিষ্টানদের নবী হযরত ঈসা (আ.) তো স্বশরীরে চতুর্থ আসমানে অবস্থান করছেন। যখন তাঁর পৃথিবীতে নামবার সময় হবে তখন কি আল্লাহ্ তাআলা একথা বলবেন না যে, হে ঈসা! তোমার এখন নামবার সময় হয়ে গেছে তুমি নেমে যাও?

এই অবস্থায় মহান আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি ও চিরন্তন বিধান অনুযায়ী নানান দলে নানান মতে বহুধা বিভক্ত ইমামহীন, নেতাবিহিন, ন্যায় বিচারক হিসাবে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)কে আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। যিনি এসে আহমদীয়া জামাআত নামে এক সংগঠন স্থাপন করে শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলমান জাতিকে ঐক্যর ডাক দিলেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের সদস্য বৃন্দই আজ নিজেদের ধন সম্পদ এবং জীবনযোগে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে অমুসলমানগণকে মুসলমান বানিয়ে ইসলাম প্রবর্তক বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পতাকা সারা বিশ্বে উড্ডীন করার কাজে অহর্নিশি নিমগ্ন। একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের প্রচারকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ত্যাগের ফলেই অমুসলমানগণ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে তাদের জীবনকে ধন্য মনে করছে। ইসলাম প্রবর্তক হযরত রসূল পাক (সা.) কে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার পরিকল্পনা। আর এটা বাস্তবায়িত হবেই। দুনিয়ার কোন শক্তি নেই আল্লাহ্ তাআলার এই পরিকল্পনাকে রুখতে পারে।

গীবত ও কুৎসার কু-প্রভাব

আনোয়ারা বেগম

পবিত্র আল কুরআনে সূরা আল হোমাযার ২নং আয়াতে বর্ণিত আছে, **"ওয়াই লুল্লি কুল্লি হোমাযাতিল লুমাযাহ্"**–অর্থাৎ "দুর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দাকারী এবং অপবাদকারীর"।

এখানে "হোমাযাহ্" অর্থ ঐ ব্যক্তি যে অপরের অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা করে এবং দুর্ণাম রটায়। "লুমাযাহ্" অর্থ ঐ ব্যক্তি যে অপরের অনুপস্থিতিতেও দূর্নাম করে, উপস্থিতিতেও দূর্নাম করে। হোমাযাহ্ ও লুমাযাহ্ বাক্য দুটির মূল বিষয় হলো যা সমাজিক শান্তি-শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করে দেয় এবং ধার্মিক মু'মিন ব্যক্তিদের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত থাকে ও তাদের নামে মিথ্যা অপবাদ ও বদনাম রটনা করে। যা বর্তমানের তথাকথিত সভ্য সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে।

যে সকল মন্দ স্বভাব মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় বদ্‌জন্নি ও গীবত ওদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানে অবস্থিত। কারো সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণ করাকে "বদজন্নি" বলে আর কারো পিছনে তার দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করাকে "গীবত" বলা হয়। এ দুটোই মানবের আত্মার ব্যাধি। এ দুটো ব্যাধি যার মধ্যে রয়েছে সে নিজেও স্বান্তি পায় না আর সমাজের অন্যান্য লোকদেরকেও শান্তিতে থাকতে দেয় না। পবিত্র কুরআন করীমে কঠোর ভাবে এ দুটো দুষ্ট ব্যাধি সম্পর্কে সূরা আল্ হুজরাতের ১৩নং আয়াতে বলা হয়েছে, **"হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা অতিরিক্ত সন্দেহকে পরিহার করো। কারণ কতক ক্ষেত্রে সন্দেহ পাপ বিশেষ এবং তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করিও না আর একে অপরের পিছনে গীবত বা কুৎসা করে বেড়িওনা। তোমাদের মধ্যে কেউ কি কারো মৃত ভাইয়ের গোসতো খেতে চাইবে? অবশ্যই তোমরা এটাকে ঘৃণা করবে এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পুন:পুন: সদয় দৃষ্টিপাতকারী পরম দয়াময়।"** এ আয়াতে এমন কয়েকটি সামাজিক কদাচারের উল্লেখ করা হয়েছে যা অমিল, বিরোধ, মতানৈক্য ও ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটায় এবং অন্তরে কালিমা সৃষ্টি করে ও মরিচা ধরিয়ে সমাজকে কলুষিত ও পাপাঙ্কিত করে তোলে। যেমন অন্যের প্রতি হাসি ঠাট্টা ও বিদ্রুপ, ছিদ্রান্বেষণ, সন্দেহ-প্রবণতা ও পরনিন্দা-পরচর্চা। এগুলো বিশেষত: স্ত্রী লোকদের উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ তারা স্বভাবগত ভাবে ঐ পথে পা বাড়ায়। এ আয়াতে স্পষ্ট ভাবে গীবত ও কু-ধারণা বা সন্দেহকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে নবী কুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "গীবত কাকে বলে জানো? আবু হুরায়রা (রা.) বল্লেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) ভাল ভাবে জ্ঞাত আছেন। মহানবী (সা.) বল্লেন, তোমার ভাই ভালবাসেন না এমন সকল কথা তার সম্পর্কে বলা। আঁ হযরত (সা.)কে প্রশ্ন করা হলো যা আমি বলি তা যদি তার মধ্যে থাকে সে প্রসঙ্গে আপনার মত কি? তিনি (সা.) বললেন, তুমি যা বল তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে তাকে গীবত বলা যাবে আর যদি তার মধ্যে না থাকে তাহলে তাকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হবে।"

বদ্‌জন্নি বা কু-ধারণা এমন পাপ যা মানুষকে অহংকার ও আত্মম্ভরী করে মুশরেকী-আকিদার দিকে ঠেলে দেয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "সুধারণা একটি সুন্দর ইবাদত। আর কু-ধারণা থেকে সতর্ক থাকো, কারণ কু-ধারণা ভীষণ রকমের মিথ্যা। একে অপরের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণে লেগে থেকো না, নিজ ভাইয়ের ছিদ্রান্বেষণ করো না, কারো জিনিষ ছিনিয়ে নেয়ার লিপ্সা করো না, হিংসা করো না, শত্রুতা রেখো না, অবজ্ঞা করো না, যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে আল্লাহ্‌র বান্দা এবং পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থেকো। এক ভাই অন্য ভাইকে লাঞ্ছিত করো না, তাকে হেয় মনে করো না।" এক কথায় বলা যায়, প্রকাশ্য শিরকের পরে বদ্‌জন্নি বা কু-ধারণা ও গীবত গুপ্ত শির্‌ক।

কু-ধারণা একটি মন্দ আচরণ এবং একটি বিষ বিশেষ। এটা সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। সামান্য একটি কু-ধারণা বা সন্দেহ যা থেকে পরিবারে বিভক্তি সৃষ্টি হয়ে যায়। আত্মীয়তার মাঝে ফাটল সৃষ্টি হয়। কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনের আল্ হুজরাতের **১৩** নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **"ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানু ফাজতালিবু কাসীরাম মিনাজ্ যান্ন"** অর্থাৎ "হে যারা ঈমান এনেছো! অতিরিক্ত কু-ধারণা থেকে বিরত হও কেননা কখনো কখনো তা পাপের দিকে ঠেলে দেয়"। হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজ কর্মে ছোট থেকে ছোট পর্যায়েও কু-ধারণা থেকে বিরত থাকার দৃষ্টান্ত

দেখিয়েছেন যেন কোন দুর্বল শাসনের অধিকারী ব্যক্তি পদস্খলনের কারণ না হন। তিনি খুব ভালবাসার সাথে উপদেশ দিতেন যেন অন্য ব্যক্তি কেবল উপদেশের প্রভাবই গ্রহণ না করে বরং লাঞ্ছিত হয়ে যায়। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা না বললেই নয়। ঘটনাটি হলো–হযরত উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.) আনহা বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) ইতেকাফে বসা ছিলেন। আমি রাতের বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসি, কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেল, যখন ফিরে যাবার জন্য উঠলাম তখন হুযূর পাক (সা.) নিজে কিছু দূর এগিয়ে দেবার জন্য আমার সঙ্গে সঙ্গে আসলেন। আমরা উভয়ই যাচ্ছিলাম। পাশ দিয়ে দু'জন আনসারী যাচ্ছিলেন। আনসারী দুজন হুযূর পাক (সা.)কে দেখে দ্রুতবেগে হেঁটে চলে যাচ্ছিলেন। হুযূর পাক (সা.) তাদের বললেন, থামো! এ আমার স্ত্রী সাফিয়া! এরপর সেই যুবক আনসারীদ্বয় বললেন, সুব্হানাল্লাহ্! ময়াযাল্লাহ্! আমরা আপনার ব্যাপারে কু-ধারণা করতে পারি? হুযূর (সা.) বললেন, শয়তান মানুষের মাঝে এভাবে অনুপ্রবেশ করে চলাচল করে যেভাবে রক্ত মানুষের শিরা উপশিরায় চলাচল করে থাকে। আমার আশঙ্কা হলো, তোমাদের মনে না আবার কু-ধারণা সৃষ্টি হয়ে যায় আর তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও।' (বুখারী)

যারা ক্রমাগত ভাবে তাদের পাপাচার ও অনিষ্টকারী কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে এবং অশ্লীল কথাবার্তা ও মিথ্যা অপবাদ ছড়ানোর ব্যাপারে নিজেদেরকে জড়িত রাখবে তারা ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের অনাচার ও পাপকার্যকে প্রকাশ করে দিবেন যার ফলে তারা লজ্জিত ও অপমাণিত হবে।" পবিত্র কুরআনের সূরা আল্ নূরের ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, **'নিশ্চয়ই যারা এক জঘন্য অপবাদ রটনা করেছিল তারা তোমাদেরই মধ্য থেকে একদল ছিল'**। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা আছে। ঘটনাটি হলো–"হযরত নবী করীম (সা.) এর পবিত্র সহধর্মিনী উম্মুল মু'মি-নীন হযরত আয়েশা (রা.) (এটি পঞ্চম হিজরী সনের ঘটনা) হযরত রসূল করীম (সা.) বনু মোস্তালিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মদীনা থেকে অল্প দূরে মুসলিম সৈন্যদের রাত্রি যাপন করতে হয়েছিল। এ যুদ্ধে হুযূর পাক (সা.)-এর সঙ্গিণী ছিলেন তাঁর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.)। হযরত আয়েশা (রা.) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে তাবুর বাইরে একটু দূর চলে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ফেরার পরে তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর গলার হারখানা কোথায় যেন পড়ে গেছে যা তিনি কোন বান্ধবীর কাছ থেকে ধার নিয়ে গিয়েছিলেন। হারখানা খুঁজ করতে তিনি আবার বাইরে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন যে তাঁর বাহনের উটসহ সেনাবাহিনীর কাফেলা বহু দূর চলে গিয়েছে। তাঁর সঙ্গীরা ভেবেছিল যে তিনি যেহেতু খুব হালকা পাতলা গঠনের ছিলেন তাই হয়ত উটের উপরে গদির সাথেই আছেন। তিনি এ অসহায় অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে গেলেন। সাফওয়াল নমাক একজন মোহাজের পেছনে আসছিলেন তিনি তাঁকে দেখে চিনে ফেললেন এবং নিজের উটে চড়িয়ে নিজে তাঁর পিছনে পায়ে হেঁটে মদীনায় নিয়ে আসলেন। এ ঘটনা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই সলুল এবং কিছু মোনাফেক অপবাদ রটনা করে। হযরত আয়েশা (রা.) নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ আল্লাহ্ তাআলার ওহী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ষড়যন্ত্রকারীদেরকে শাস্তিও দেয়া হয়েছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে মিথ্যা অভিযোগের রটনা এবং অপপ্রচার সতীত্বের বিরুদ্ধে অসৎ কর্মের সমতুল্য জঘন্য অপরাধ। ইসলাম উভয় অপরাধের জন্য নিন্দা করেছে এবং শাস্তিরও ব্যবস্থা করেছে।

সূরা আন্ নূরের ২২নং আয়াত **"ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানু লা তাওবিয়ু খুত্ ওয়াতিশ্ শাইতানা"** অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না।" আসলে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশ্য অসৎকর্ম করতে দ্বিধা ও আতঙ্ক-বোধ জন্মগত ভাবে রোপিত। তাই শয়তান তার প্রতারণার স্বীকারকে ধাপে ধাপে নৈতিক ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে। প্রথমে কৌশলে বা গোপনে মানুষের নামে অপবাদ দেওয়া আরম্ভ করে এবং পরে সেই অপরাধটি নিজেই করে বসে।

কতিপয় দোষ মানুষের জন্য অবধারিত দীর্ঘস্থায়ী অকল্যাণ বয়ে আনে তা হলো জাতিগত ও বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব ও আত্মম্ভরিতা বা অহংকার। কিন্তু ইসলাম ধর্ম পুণ্যকর্ম ও ধর্মপরায়ণতা ভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়া অন্য কোন কিছুকেই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি বলে স্বীকার করে না।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ। প্রথমতঃ তার রক্ত; দ্বিতীয়তঃ তার সম্মান এবং তৃতীয়তঃ তার সম্পদ। মহান আল্লাহ্ তাআলা বান্দার শারিরীক সৌন্দর্যকে দেখেন না এবং তার ধনসম্পতিও দেখেন না বরং তার দৃষ্টি বান্দার হৃদয়ের ওপর নিবদ্ধ। হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বীয় বক্ষের দিকে ইঙ্গিত

করে বলেছেন, "তাক্‌ওয়া এখানে আছে, তাক্‌ওয়া এখানে আছে অর্থাৎ তাক্‌ওয়ার স্থান হলো হৃদয়"। অতএব তাক্‌ওয়া বা খোদাভীতি যার আছে কোন অপকর্ম তাকে স্পর্শ করতে পারে না। অর্থাৎ শয়তান তার কাছে ঘেঁষতে পারে না।

গীবত করা মানে পাপকে ডেকে আনা। প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন মুসলিম ও বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, "তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ রেখো না, নিজ ভাইয়ের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগীরি করো না, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করো না, একে অন্যের পুন্যে সওদা করো না, পরস্পর আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান বান্দা এবং ভাই ভাই হয়ে থেকো।"

আবার হাদীস মুসনাদ শরীফে বর্ণিত আছে, 'তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে যেন আল্লাহ্‌র সম্পর্কে সু-ধারণা পোষণ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।" আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "তোমরা আত্মসমর্পনকারী না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" মোমেন ও মুত্তাকী যাঁরা তাঁরা সর্বক্ষণই খোদার চিন্তায় এমনই বিভোর থাকেন যে সর্বাবস্থাতেই তারা নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে রাখেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন বান্দার ধারণানুযায়ী আমি তার নিকটে প্রকাশিত হয়ে থাকি। অতএব আল্লাহ্ সম্পর্কে সু-ধারণা রেখে জীবন যাপন করা উচিত। মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে উপস্থিত হতে পারে অতএব বান্দার উচিত আল্লাহ্ সম্পর্কে সু-ধারণা পোষণ করা। আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া এক জঘন্য বিষয় এবং এ বিষয়টাকে কোন ভাবেই ছোট করে দেখা যায় না। যারা এ ধরনের মিথ্যা অপবাদ দেয় তারা শীঘ্রই তাদের যোগ্য পরিণাম লাভ করবে অর্থাৎ ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

হাদীস আবু দাউদ শরীফে বার্ণিত আছে, "শয়তানের ধ্যান-ধারণা মানুষের মধ্যে রক্তের প্রবাহের মতই প্রবাহিত হয়। আমার ভয় হয় যে আমাদের হৃদয়ে সে শয়তানী ধ্যান-ধারণা কোন কু-ধারণার উদ্রেক না করে, কোন ফ্যাসাদ সৃষ্টি না করে। কারণ ফ্যাসাদ হত্যা অপেক্ষা জঘন্য।" আল্লাহ্ ও তাঁর প্রত্যাদিষ্ট নবী রসূলগণের সম্পর্কে যেখানে খারাপ ধারণা আলোচনা হয় সে স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ আছে।

পবিত্র কুরআন করীমে ভাল কথাকে "ভাল-বৃক্ষের সাথে" এবং মন্দ কথাকে "মন্দ বৃক্ষের সাথে" তুলনা করা হয়েছে। "ভাল বৃক্ষ" হলো যার শিকড় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং যার শাখা-প্রশাখা সমূহ আকাশে বিস্তৃত রয়েছে। আর "মন্দ বৃক্ষ" হলো যাকে ভূমির ওপর থেকে উৎপাটিত করে দেয়া হয়েছে, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। অতএব গীবত, পরনিন্দা, কুৎসা ইত্যাদি সবকিছুকেই মন্দ-বৃক্ষের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, "আমি হযরত রসূল করীম (সা.)-এর খেদমতে আরয করলাম যে, সুফিয়া (রসূল (সা.) এর এক বিবির নাম) খাটো। আঁ হযরত (সা.) বললেন, হে আয়েশা! তুমি এমন একটা কটু কথা বললে যা ভরা নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করলে তাকেও তিক্ত করে ফেলবে" (আবু দাউদ)।

আহমদীয়া জামাআতের প্রতিশ্রুত ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "আগুন যেমন খড়কুটাকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয় গীবত বা পরনিন্দা তেমনি মু'মিনের ঈমানকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়।" বহু মন্দকর্ম কেবল কু-ধারণার জন্যই সৃষ্টি হয়। কারো সম্পর্কে একটি কথা শুনে তৎক্ষণাত বিশ্বাস করে নেওয়া একটি অত্যন্ত জঘন্য বিষয়। যে বিষয় সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান এবং বিশ্বাস নেই সেটিকে হৃদয়ে স্থান দেয়া এবং মুখে উচ্চারণ করা উচিৎ নয়।" তিনি আরো লিখেছেন, "কুরআন করীমের শিক্ষা এই নয় যে দোষ দেখে তা চূড়ান্ত এবং অন্যদের বলে বেড়াও; বরং বলা হয়েছে যে, "সে ধৈর্য ও দয়ার সহিত উপদেশ দেয়।" দয়া এটাই যে, অন্যের দোষ দেখে তাকে উপদেশ দিতে হবে এবং তার জন্য দোয়াও করতে হবে। দোয়াতে বড়ই প্রভাব আছে। ঐ ব্যক্তি খুবই আফসোসের যোগ্য, যে একজনের দোষ শতবার বর্ণনা করে, কিন্তু দোয়া করে না একবারও। কারো দোষ ঐ সময়ে বর্ণনা করা উচিত যখন এর পূর্বে তার জন্য কমপক্ষে চল্লিশ দিন কেঁদে কেঁদে

দোয়া করা হয়ে থাকে।" এ সম্পর্কে একটি ঘটনা আছে। ঘটনাটি হলো "এক সুফীর দুইজন শিষ্য ছিল। তাদের মধ্যে একজন মদ পান করলো আর বেহুঁশ হয়ে নর্দমায় পড়ে গেল। অপর জন সুফীর কাছে অভিযোগ করলো। সুফী বললেন, তুমি বড় বেয়াদব যে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছো? বরং গিয়ে তাকে উঠিয়ে আন নাই? শিষ্য তক্ষুনি গেল আর তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসলেন। লোকজন বলাবলি শুরু করলো যে একজন তো মদ পান করেছে দ্বিতীয়জন কম পান করেছে। তাই সে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। এখানে সুফীর বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কেন তুমি তোমার ভাইয়ের কুৎসা করলে?"

সূরা আল্ হুজরাতের ১৩নং আয়াত

থেকে প্রমাণিত হয় যে, যারা ঐশী সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কুৎসাকারীও হয়ে থাকে। যদি এরূপ না হতো তবে এ আয়াত অর্থহীন হয়ে যেত। যদি মু'মিনরা এরূপ পবিত্র হতো এবং তাদের দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত না হতো তবে এ আয়াতের কি প্রয়োজন ছিল?

সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৭নং আয়াতে বর্ণিত আছে, "এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পশ্চাদানুসরণ করিও না। নিশ্চয় কর্ন, চক্ষু এবং হৃদয় এদের প্রত্যেকটি তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।"

এ আয়াত সন্দেহের মূল কর্তন করে, যার অবলম্বন সম্ভবতঃ কর্ণ, চক্ষু এবং মন। কর্ণ হলো প্রথম প্রবেশ পথ যার মাধ্যমে অধিকাংশ সন্দেহ একজনের মনে প্রবেশ করে থাকে। বেশীর ভাগ সন্দেহই যা অন্যের সম্বন্ধে শুনে তা অবিবেচনাপ্রসূত মন্দ বর্ণনা দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে। তৎপরবর্তী উপায় বা বাহন হলো দৃষ্টি। এক ব্যক্তি অন্যকে কোন বিশেষ এক কাজ করতে দেখে তার কদর্য করে বসে এবং কর্তার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠে। সর্বশেষ এবং অতি নিকৃষ্ট প্রকারের সন্দেহ, যা কোন ব্যক্তি অন্য কারো সম্বন্ধে পোষণ করে, তা না তো অপরের কাছ হতে মন্দ কথা শোনার কারণে, না সেই ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ সন্দেহ পোষণকারীর ব্যাধিগ্রস্ত মনের কু-ধারণা প্রসূত উদ্ভাবনা। এরূপে আয়াতটি শুধু মানুষের জীবন ও সহায় সম্পত্তিকেই নয় বরং এটা মানবিক মর্যাদা এবং সম্মানকেও পবিত্র করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে, কারো সম্মানের ওপর আঘাতের জন্য অবশ্যই জবাব দিতে হবে।

আবার সূরা ক্বাফ ১৯ নং আয়াতে বর্ণিত আছে, "যে শব্দই তার মুখে উচ্চারিত হয়, তা সংরক্ষণের জন্য একজন সর্বক্ষণ প্রস্তুত পর্যবেক্ষক নিযুক্ত রয়েছে।" মূল কথা খোদা তাআলাই সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণকারী। বান্দার যাবতীয় কাজকর্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধকারী। বান্দার উপায়ই নেই খোদা তাআলার চোখকে ফাঁকি দেবার।

হাদীস বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, "বান্দা যখন ভালমন্দ বিচার না করেই কোন কথা বলে, তখন তার কারণে সে নিজেকে জাহান্নামের এত দূর গভীরে নিয়ে যায় যা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান।"

হাদীস মুসলিম শরীফে বলা হয়েছে, "যদি আলোচিত দোষ ব্যক্তির মধ্যে সত্যই থেকে থাকে তবেই তো গীবত সেটা, আর যদি দোষ তার মধ্যে না থাকে তবে তার ওপর মিথ্যা অপবাদ বা দূর্নাম আরোপ করা হলো।"

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিসের (জিহ্বা বা বাক্ শক্তি) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী জিনিসের নিশ্চয়তা দিতে পারবে আমি তার বেহেশ্‌তের জন্য জামিন হতে পারি।" (বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "কোন ব্যক্তির নামে গীবত, কু-ধারণা, অপবাদ বা কোন বদনাম বলার পূর্বে তার জন্য চল্লিশ দিন দোয়া করা উচিত। একটি ঘটনা আছে–"হযরত গোলাম রসূল রাজেকী হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তার দোয়া অত্যন্ত কবূল হতো। একবার তার কাছে জনৈক আহমদী যুবক কোন একজনের নামে বদনাম করেছিল। এতে তিনি বদনামকারী ঐ যুবকের হাত খপ্ করে চেপে ধরেন এবং টেনে এক নিরিবিলি স্থানে নিয়ে যান এবং বল্লেন, তুমি যা বলেছো তা যদি সত্য হয় তাহলে তার ভাল হওয়ার জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত। এ বলে তিনি দোয়া করার জন্য হাত ওঠালেন। সে এক লম্বা সময় তা শেষ হতে চায় না। বহুক্ষণ ধরে দোয়া শেষ হলো। পরে ঐ যুবক অন্যদেরকে বললো, সাবধান! রাজেকী সাহেবের সামনে কখনো কারো নামে কোন কথা বলিও না। কারণ গত দিন আমার এ অবস্থা হয়ে গিয়েছিল যে দীর্ঘ সময় দোয়া করতে করতে আমি অধৈর্য হয়ে গিয়েছিলাম কখন দোয়া করা শেষ হবে? যাহোক কিছুদিন পরে দেখা গেল যার জন্য দোয়া করা হয়েছিল সেই ব্যক্তি শুদ্ধ মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। দোয়া করার বড়ই সুপ্রভাব প্রমাণিত হলো।

"তারাই আল্লাহ্‌র উত্তম বান্দা যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়। পক্ষান্তরে তারাই আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দা যারা চোগলখুরী করে বেড়ায়, বন্ধুদের মেধ্য বিভেদ সৃষ্টি করে বেড়ায় এবং পূত-পবিত্র লোকদের প্রতি অপবাদ আনতে প্রয়াস পায়"। (আহমদ ও বায়হাকী)

আসলে গীবত অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যেই করা হয়। এর দ্বারা অপরের মান সম্মানের প্রতি আঘাত হানা হয়। হাদীস মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষত্রুটি ঢেকে রাখে, আখিরাতে আল্লাহ্ তাআলা তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন।"

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "মিরাজের রাতে আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাদের হাতের

নখ ছিল তামার এবং তা দ্বারা তাদের মুখ ও বুক আঁচড়াচ্ছিল। জিবরাঈলের নিকট আমি প্রশ্ন করলাম, "এরা কারা?" তিনি জবাব দিলেন এরা ঐ সকল লোক যারা মানুষের পচা গোশ্‌তো খেত এবং যারা তাদের সুনাম ও সম্মানে আঘাত করতো।" (আবু দাউদ)

এ সম্পর্কে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস আছে। তা হলো–"গীবত ব্যাভিচার হতেও জঘন্য। সাহাবাগণ (রা.) আরজ করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! গীবত কিভাবে ব্যাভিচার হতে জঘন্য? তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি যখন ব্যাভিচার করে অতঃপর তওবা করে, ফলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু গীবতকারীকে আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করেন না। যিনাকারী তওবা করে কিন্তু গীবতকারীর তওবা নেই।" (বায়হাকী)

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'কিশ্‌তিয়ে নূহ' পুস্তকে লিখেছেন, "সকল ব্যাভিচারী, পাপী, মদ্যপায়ী, খুনী, চোর, জুয়ারী, বিশ্বাসঘাতক, উৎকোচ গ্রহণকারী, শঠ, অত্যাচারী, মিথ্যাবাদী, জালিয়াত এবং তাদের সঙ্গী, যারা নিজেদের ভ্রাতার এবং ভগ্নীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে এবং নিজেদের কুকর্ম হতে তওবা করে না এবং কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, তারা আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। এ সকল কাজ বিষ বিশেষ। তা পান করে তোমাদের পক্ষে জীবিত থাকা কখনো সম্ভব নয়। অন্ধকার ও আলো কখনো একত্রে থাকতে পারে না, যে ব্যক্তির মন কুটিলতাময় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে নিজ সম্বন্ধ পরিষ্কার করে না, সে কখনই সেই আপোষের অধিকারী হতে পারে না, যা সরল হৃদয় ব্যক্তিদের ভাগ্যে জুটে থাকে।"

"ফালা তাকুনান্না মিনাল্ মুম্‌তারীন" অর্থাৎ "তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।" সন্দেহ ভয়ংকর মিথ্যা বিষয়। অতএব, সন্দেহ সম্পর্কে সতর্ক থাকো। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "আমি সত্য সত্য বলছি যে, কু-ধারণা অত্যন্ত মারাত্মক বিপদ যা মানুষের ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়। বস্তুতঃ এটা এক মারাত্মক ব্যাধি যার ফলে মানুষ অতি শীঘ্র ধ্বংস হয়ে যায়।

এ সম্পর্কে একটি ঘটনা আছে–"এক বুযুর্গ আল্লাহ্ ওয়ালা ছিলেন। তিনি একবার প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আমি নিজেকে কারো চাইতে উত্তম মনে করবো না। একবার তিনি নদীর তীরে পৌছেন এবং সেখানে দেখেন, এক ব্যক্তি নদীর তীরে বসে এক যুবতী স্ত্রীলোকের সাথে একত্রে রুটি খাচ্ছে, পাশে একটি বোতলও আছে যা থেকে সে গ্লাস ভরে ভরে পান করছে। দূর থেকে তিনি বললেন, আমি তো প্রতিজ্ঞা করেছি যে নিজেকে কারো চেয়ে উত্তম মনে করবো না। কিন্তু এখন দেখছি এদের দু'জনের চাইতে তো আমি উত্তম। এমন সময় হঠাৎ জোরে বাতাস উঠলো আর নদীতে তুফান আসলো। একটা নৌকা ঝড়ে কবলিত হলো আর সেটি ডুবে গেল। যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে যে পুরুষটি রুটি খাচ্ছিল সে নদীতে ঝাপ দিল আর ডুবে যাওয়া নৌকার ছয়জনকে উদ্ধার করে আনলো। তাদের জীবন বেঁচে গেল। অতঃপর ঐ যুবকটি বুযুর্গকে সম্বোধন করে বললো–তুমি নিজেকে আমার চাইতে উত্তম মনে করো। আমি তো ছয়জনের জীবন বাঁচিয়েছি এখন একজন বাকী আছে তুমি তাকে উদ্ধার করে আনবে। এ কথা শুনে বুযুর্গ খুব অবাক হলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি আমার এই চিন্তা ভাবনা কি করে বুঝতে পারলে? তখন যুবকটি বললো, এই বোতলে নদীর পানি আছে এতে কোন মদ নেই এবং এই স্ত্রীলোকটি আমার মা। আমি তার একটিই সন্তান। খোদা তাআলা আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, আমি যেন এরূপ করি যাতে তুমি শিক্ষা গ্রহণ করো। অতএব জলদি কু-ধারণা করা ঠিক নয়। (মালফুযাত ৪র্থ খন্ড)

সমাজে কু-ধারণাও সন্দেহ নানা ভাবে বিস্তার লাভ করে। বউ শাশুরি সম্পর্কে কু-ধারণা করছে, শাশুরী বউয়ের সম্পর্কে কু-ধারণা করছে, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে কু-ধারণা করছে, স্ত্রী স্বামীর সম্পর্কে কু-ধারণা করেছে, সন্তানরাও বাদ যাচ্ছে না, তারা বাবা মা সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণ করছে! ফলাফল কি দাঁড়াচ্ছে? বিশৃঙ্খলা অশান্তিতে সমাজ তথা পরিবারগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান যুগে আহমদীয়া জামাআতের বিরুদ্ধে যেভাবে কু-ধারণা করা হচ্ছে তার ফলে অনেক মানব সন্তান সত্য গ্রহণে বঞ্চিত হয়ে আল্লাহ্‌র ক্রোধ ভাজনে পরিণত হচ্ছে। সকল প্রকার পাপ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হলো "তাক্ওয়ার পথে থাকা" আর অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার পড়া"। কারণ রোগের প্রতিষেধক যেমন এন্টিবায়োটিক তেমনি আধ্যাত্মিকতার উন্নতির জন্য গীবত নামক জীবানুটির ধ্বংসের জন্য "ইস্তেগফার" নামক প্রতিষেধকটির খুবই প্রয়োজন। সুতরাং উচিত আধ্যাত্মিক কঠিন এ ব্যাধিগুলো থেকে রক্ষা পেতে হলে তাকে অবশ্যই তাক্ওয়ার পথে চলতে হবে। মহান খোদা তাআলা আমাদেরকে গীবত পরিহার করে সৎপথে চলার তৌফিক দিন, আমীন।

স্মৃতিতে অম্লান এক মহীয়সী নারীর জীবন কথা

–সৈয়দ মমতাজ আহমদ

মোহতারমা মাসুদা সামাদ সাহেবা, পিতা-মাতা উভয় দিক থেকেই ছিলেন ঐতিহ্যবাহী অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত মুসলিম উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে। তাঁর পিতা নাটোরের প্রসিদ্ধ জমিদার পরিবারের সন্তান খান বাহাদুর আবুল হাসেম খান চৌধুরী সাহেব (রহ.) সেই বৃটিশ আমলে স্বীয় প্রতিভা ও কর্ম-দক্ষতা বলে Addl. D.P.I হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। খান বাহাদুর সাহেবের ১৯১৫ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয় এবং বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের পথিকৃৎ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মরহুম সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের বড় কন্যাকে বিবাহ করেন। খান বাহাদুর সাহেব ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪২ সন পর্যন্ত তদানীন্তন বঙ্গীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রাদেশিক আমীরের গুরুদায়িত্বও পালন করেছিলেন। পরবর্তীতে পরিবারসহ তিনি কাদিয়ানে হিজরত করেন। মোহতারমা মাসুদা সামাদ সাহেবা লেখাপড়ার প্রতি বেশ মনোযোগী ছিলেন এবং তার শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তার পিতা-মাতাও যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। সেই সুবাদে শৈশব থেকেই তার তা'লিম তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তার পিতা-মাতা বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন। ফলে অল্প বয়সে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন। কাদিয়ানের সত্যিকারের ইসলামী ভাবধারা তথা আহমদীয়াতের ধর্মীয় পরিমন্ডলেই তিনি বড় হয়ে উঠেন এবং কুরআন, হাদীস ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাহাবীদের কারো কারো সাথে তাঁর পত্রালাপও ছিল ও তাঁদের দোয়া লাভ করেন। মাসুদা সামাদ সাহেবা উর্দু ভাষাও জানতেন। শুধু জানতেন বললেই হবে না। উর্দু ভাষায় তাঁর অপরিসীম দক্ষতাও ছিল। ইংরেজি ও ফারসিও ভালো জানতেন তিনি। তদুপরি বাংলা ভাষার প্রতিও অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল।

নাটোরের প্রখ্যাত 'খান চৌধুরী' পরিবারের ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবের সাথে তাঁর বিবাহ সুসম্পন্ন হয় ১৯৪৯ ইং সালের ৯ই অক্টোবর রাবওয়াতে। রাবওয়া আবাদ হওয়ার পর এটিই ছিল প্রথম বিয়ের অনুষ্ঠান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) নিকাহ্ পড়ান। তাঁর স্বনামধন্য স্বামী মরহুম ডা: আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবও একজন নিষ্ঠাবান আহমদী ও এক প্রিয় বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং দীর্ঘকাল বিভিন্ন পর্যায়ে জামাআতের অপরিসীম খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মানবীয় গুণাবলীর জন্য ডা: সাহেব চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

মায়ের কোলেই হলো সন্তানের প্রথম শিক্ষালয় এবং মায়ের নিকটই সন্তানের চরিত্র গঠনের ভিত্তিমূল স্থাপিত হয়। বেগম মাসুদা সামাদ সাহেবা এমন শ্রেণীর মায়েদের অন্তর্ভুক্ত যাদের কোলে সন্তানদের কেবল শারীরিক প্রতিপালনই হত না, বরং সন্তানের জন্য তারা এমন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান ছিলেন যেখানে কিতাব-পত্র ও খাতা-কলম ছাড়াই কেবল আমলের মাধ্যমে সন্তানদের তা'লীম-তরবিয়ত ও উন্নত চরিত্রের বুনিয়াদ স্থাপিত হত। আক্ষরিক অর্থে বেগম মাসুদা সামাদ সাহেবার মধ্যে এক আদর্শ আহমদী মুসলিম রমণীর প্রায় সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান ছিল। ব্যক্তি জীবনে দ্বীনের অনুসরণ ও সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে একজন আদর্শ আহমদী মায়ের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজ গঠনে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা আমাদের নতুন প্রজন্মের লাজনা বোনদের জন্য অনুকরণীয়। তাঁর ছেলেমেয়েরা সবাই তাঁর অনুপম আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাঁর সুযোগ্য পুত্র আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী একজন ওয়াকেফে জিন্দেগী, সদর মোবাল্লেগ ও জামাআতের সেবায় নিয়োজিত। আর্থিক কুরবানীতেও এ পরিবারটি বাংলাদেশে আহমদীয়াতের ইতিহাসে খেদমতের ক্ষেত্রে এক বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত।

ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক আত্মীয়তার পরিমন্ডলে মোহতারমা মাসুদা সামাদ সাহেবা আমার ফুফাতো বোন ছিলেন। তাঁর প্রিয় মামুজানের বড় সন্তান হিসেবে আমাকে তিনি একটু বেশীই স্নেহ-আদর করতেন। আমার সাথে মাসুদা বুবু'র এক বিশেষ আত্মিক স্নেহপ্রবণ সম্পর্ক ছিল। যাই হউক যখনই দেখা হতো তখনই আমরা তাঁর অপার স্নেহে সিক্ত হতাম। তিনি আমাদের প্রাণ ঢেলে ভালবাসতেন। তাঁর মাঝে মাতৃস্নেহের কোমলতা ছিল। তিনি আমাদের পরিবারের সকলের একান্ত আপনজন ছিলেন এবং সকলের সুখ-দুঃখের সাথী ছিলেন।

বেগস মাসুদা সামাদ সাহেবা দীর্ঘকাল লাজনা ইমাইল্লাহ্র (সভানেত্রী) সদরের গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও পারদর্শীতার সাথে পালন করেন। তিনি একাধারে কুরআন, হাদীস, ফেকাহ্, ইতিহাস, সাহিত্য, বক্তৃতা, সুন্দর হস্তাক্ষর ইত্যাদি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। মোটকথা তিনি বাংলাদেশে আহমদী মহিলাদের 'মধ্যমণি' ছিলেন। সত্যিকার অর্থেই বেগম মাসুদা সামাদ সাহেবা ছিলেন একজন খ্যাতিমান আবেদা, আরেফা বুযুর্গ মহিলা। নিয়মিত ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে নামাযের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল উল্লেখ করার মত। তিনি অত্যন্ত নেককার-পরহেজগার ও খোদাভীরু মহিলা ছিলেন। মোহতারমা মাসুদা সামাদ সাহেবা ইবাদত-বন্দেগী ও মোজাহেদার ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশে আহমদীদের মাঝে এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। একাধারে তিনি ইল্মে তাফসীর, ইল্মে হাদীস এবং আহমদীয়াতের জ্ঞানে সমান দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর বহুমুখী প্রতিভার

কারণে তিনি ধনী-গরীব, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের নিকট শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। সাধারণভাবে তিনি ইল্‌মে দ্বীনের প্রায় সকল বিভাগেই প্রভূত পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তবে ইল্‌মে তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর পান্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তাঁর মাধ্যমে বহু পরিবার আহমদীয়াতের আলোর সন্ধান পায়। দয়ার্দ্রচিত্ত পরোপকারী মাসুদা সামাদ সাহেবা এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর অসুস্থতা সত্ত্বেও নিজ সংসার ফেলে জামাআতের যেকোন প্রয়োজনে বাংলাদেশের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছুটে যেতেন।

তিনি একদিকে বুদ্ধি-জ্ঞান-বিচক্ষণতা দিয়ে তাঁর স্বামীর প্রধান পরামর্শদাতা ও মনে উৎসাহ, উদ্যম ও প্রেরণাদাতার কাজে আঞ্জাম দিতেন। জীবদ্দশায় বেগম মাসুদা সামাদ সাহেবা বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর কবরটি যেন তাঁর স্বামীর পাশে হয়। ঠিক সেইমতে তাঁকে নাটোরে মরহুম ডা: আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবের কবরের পাশেই সমাহিত করা হয়েছে। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই পবিত্র হজ্জ পালন করেন এবং তাঁরা ওসীয়্যতকারীও ছিলেন। বর্তমান যুগে রাবেয়া বসরী ও রাবেয়া আদবিয়ার ন্যায় মোহতারমা মাসুদা সামাদ সাহেবা পর্দার ভিতর থেকে ইল্‌ম-আমল, তাক্‌ওয়া-পরহেজগারী এবং কুরআন হাদীসের ইল্‌ম বিস্তারের ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন অন্যান্য নারীদের ক্ষেত্রে তা কল্পনা করারও কোন অবকাশ নাই। ইল্‌ম আমল, তাক্‌ওয়া-তাহারাত ও বুজুর্গীতে তিনি ইসলামের তথা আহমদীয়াতের স্বর্ণযুগের মহিলাদের নমুনা ছিলেন। তাহার ইন্তেকালে শুধু যে তার সন্তানগণই তাদের মাতাকে হরিয়েছেন তা-ই নয়, বরং মাসুদা সামাদ বুবু'র দ্বীনি মহিব্বীগণও তাদের একজন অতি আপন আস্থাভাজন ধর্মীয় মুরব্বীর ছায়া হতে বঞ্চিত হয়েছেন।

ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি অপরাপর নফল ইবাদত ও গৃহকর্মের ক্ষেত্রেও নিয়মানুবর্তীতা ছিল তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দান খয়রাতের ক্ষেত্রেও তিনি উদারহস্ত ছিলেন। পাই পাই হিসাব করে জামাআতের প্রয়োজনীয় চাঁদা সমূহ ও যাকাত আদায় করতেন। মাসুদা সামাদ সাহেবার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল-তিনি কোন মানুষকেই হীন মনে করতেন না এবং সকলের সঙ্গেই উত্তম ব্যবহার করতেন। জীবনে তিনি কোন সায়েল ও সাহায্য প্রার্থীকে খালি হাতে ফেরৎ দেন নাই। সাহায্য প্রার্থী সকলকেই তিনি কিছু না কিছু সাহায্য করেছেন। অনেক বিধবাকে তিনি নিয়মিত আর্থিক সাহায্য প্রদান করতেন। তিনি এতিমও প্রতিপালন করেছেন এবং বহু দুস্থ পরিবারকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছেন।

মোহতারমা মাসুদা সামাদ সাহেবার আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল–তিনি অত্যন্ত চমৎকার বয়ান করতে পারতেন। বয়ানের প্রতিটি বিষয় কুরআন হাদীস ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রকৃত শিক্ষার আলোকে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা উপস্থাপন করতেন। তাঁর মজলিসে মহিলাগণ বিপুল সংখ্যায় জমায়েত হতেন। তার ইখলাসপূর্ণ বয়ান শুনে বহু মহিলা হেদায়তের নূর প্রাপ্ত হয়েছেন। কালামে পাকের তেলাওয়াতের মাঝে তিনি অন্তহীন আত্মসুখ অনুভব করতেন। তার তফসীর শুনে শ্রোতাদের অন্তরে আল্লাহ্ পাকের আজমত ও মহব্বত পয়দা হত। মোহতারমা মাসুদা সামাদ সাহেবা তাঁর জীবনে ইসলামের দু'টি মৌলিক আমল যথার্থই পালন করতে পেরেছেন এবং তাঁর জীবনের স্বার্থকতা ও সফলতা : মৌলিক আমলের প্রথমটি হলো নামায ও দ্বিতীয়টি 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহর পথে খরচ করা। প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি আমলই ইসলামী শিক্ষার সারাংশ। বাকী সব আমল এ দুটি আমলেরই শাখা-প্রশাখা এবং এ দু'টি আমল থেকে প্রবাহিত ধারা উপধারা। তাঁর আর একটি বড় গুণ ছিল দোয়া করা। তিনি সবার জন্য দোয়া করতেন – তাঁর দোয়ায় সমস্ত জামাআত অন্তর্ভুক্ত থাকতো–তিনি ব্যাকুলতা ও অত্যন্ত আকুতির সাথে দোয়া করতেন। মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পবিত্র ইলহামী দোয়া সমূহ তাঁর অনেকটা মুখস্থই ছিল। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যের আর একটি বিশেষ গুণের কথা না বললেই নয়, আর সেটা হলো মেহমানদারি ও দাওয়াত করে সবাইকে খাওয়ানো এবং সেই সাথে মহানবী (সা.) এর সুন্নত অনুযায়ী ছোট বড় সকলকেই কিছু না কিছু একটা উপহার/তোহফা প্রদান করা, আর এটি তাঁর একটা রুটিনের মতই ছিল।

মরহুমা ৪ পুত্র, এক কন্যা, পুত্রবধূ জামাতা, নাতি-নাতনি সহ পরিবারের সবাইকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই এবং দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তাআলা তাদের সবাইকে সাবরে জামিল দান করেন। মানুষের জীবনে নিজের অনুভূতি সবটাই এক সময় প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তাঁর মৃত্যুর হৃদয় বিদারক সংবাদটি শুনার পর আমার মনে হয়েছে যে, 'মহামূল্যবান কোন একটি জিনিষ আমার কাছ থেকে সব সময়ের জন্য হারিয়ে গেল'। যাই হোক পরিশেষে মহান আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দোয়া করি–'হে রব্বুল আলামীন! আমার প্রিয় মাসুদা বুবুকে বেহেশ্‌তের উচ্চ মোকাম দান কর এবং তাঁর উত্তরসূরীদেরকে বংশ পরম্পরায় নেক কাজে প্রতিযোগী বানাও আর জামাআতের খিদমতে বিশেষ ভূমিকা রাখার সৌভাগ্য দান কর, আমীন'।

May Allah shower
His choicest blessings upon her
and envelop her in His mercy.

[লেখক ঃ মরহুমার মামাতো ভাই]

জামাআত ও অংগসংগঠন সমূহের কর্মতৎপরতার সংবাদ

ডেস্ক নিউজ ঃ হোসনে মোবারক

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

১৯ ডিসেম্বর ২০০৮, মিরপুর।

১৬ই ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবস। বাংলাদেশীদের এ এক গৌরবের দিন। ১৯৭১ সালের এ দিনে সাড়ে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এ দেশ স্বাধীন হয়।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মিরপুরের উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী কর্মসূচী পালন করা হয় (আলহামদু লিল্লাহ্)। ১৫ই ডিসেম্বর বিকাল ৪ টায় মসজিদ কমপ্লেক্সের বাইরের রাস্তায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের (ওয়াকারে আমল) আয়োজন করা হয়। উক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান ওয়ার্ড নং-৭ এর কমিশনারের কার্যালয় হতে শুরু হয়ে মিরপুর মসজিদের সামনে এসে শেষ হয়। এ অভিযানে ওয়ার্ড নং ৭ এর **কমিশনার জনাব বজলুল বাসিত আনজু** উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় আমীর মেজর (অব.) জনাব আকরাম আহমদ খান চৌধুরী দোয়ার মাধ্যমে এ অভিযান উদ্বোধন করেন। কমিশনার সাহেব প্রথমে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করে। অতঃপর স্থানীয় খাদেমগণ রাস্তার দু'পাশ ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে, ময়লা আবর্জনা তুলে ডাস্টবিনে ফেলে। মসজিদ কমপ্লেক্সের সামনে এসে এ অভিযান সমাপ্ত হয়।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মিরপুর কর্তৃক মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত ওয়াকারে আমল কর্মসূচী ও র‍্যালির দৃশ্য

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মিরপুরের উদ্যোগে ১৬ ডিসেম্বর র‍্যালি ও দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল ৯ টায় জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় জামাতের নায়েব আমীর সাহেব। আরও উপস্থিত ছিলেন নায়েব সদর সাহেব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ। রিজিওনাল কায়েদ সাহেব, ঢাকা-বরিশাল এবং স্থানীয় কায়েদ সাহেব। এরপর দোয়া করে সকাল ৯-৩০ মিনিটে মিরপুর মসজিদ হতে র‍্যালী করে বোটানিক্যাল গার্ডেনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়া হয়। গার্ডেনে ছোট আতফালদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বড় আতফাল ও খোদ্দামদের নিয়ে চারটি টিম গঠন করে নক-আউট ভিত্তিতে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এরপর গার্ডেনেই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে আহমদী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোশারফ হোসেন তার যুদ্ধ জীবনের কাহিনী আমাদের সামনে তুলে ধরেন। যা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ও মর্মস্পর্শী এসব নতুন প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় ছিল। সেমিনারের মাধ্যমেই অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে ব্যাপক সংখ্যক আতফাল, খোদ্দাম, আনসার সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

রাহাত মিয়াজি তাপশ

আহ্বায়ক

বিজয় দিবস উদযাপন কমিটি।

'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তকের ওপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

১৫ ডিসেম্বর ২০০৮, সিলেট।

গত ১৪-১১-০৮ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, সিলেট

কর্তৃক আয়োজিত হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত 'আল ওসীয়্যত' পুস্তকের ওপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ইকবাল চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, সিলেট। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব গোলাম গাউছ সাহেব। অতঃপর 'আল ওসীয়্যত' পুস্তকের ওপর আলোচনা করেন জনাব শাহীন আহমদ, জনাব বদরুল ইসলাম, জনাব আরিফ আহমদ, জনাব তসলীম ভূইয়া, জনাব সোহেল আহমদ। অতঃপর সভাপতি সাহেবের সমাপনী বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার কার্যক্রম শেষ হয়। সভায় উল্লেখ্যযোগ্য সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

সোহেল আহমদ

জেনারেল সেক্রেটারী

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, সিলেট

ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠান উদযাপিত

১৫ ডিসেম্বর ২০০৮, ফতুল্লা।

গত ১২/১২/০৮ রোজ বৃহস্পতিবার বাদ আসর ফতুল্লা মসজিদে ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয় (আলহামদুলিল্লাহ্)। উক্ত অনুষ্ঠানে সভপতিত্ব করেন স্থানীয় কায়েদ জনাব ফরিদ আহমদ। কুরআন ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে ডা. বশির আহমদ ও নাহিদ আহমদ। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুল কাদির (জেনারেল সেক্রেটারী, ফতুল্লা)। উক্ত অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখেন জনাব শামসুদ্দিন আহমদ, জানব মুসলেম উদ্দিন আহমদ ও মৌলবী মোহাম্মদ আমীর হোসেন। নসীহত মূলক বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি জনাব আব্দুর কাদির।

উল্লেখ্য যে, উক্ত দিবস উপলক্ষ্যে আতফাল ও নাসেরাতদের কৌতুক, কবিতা ও নযম প্রতিযোগিতা নেয়া হয় এবং সবাইকে পুরস্কৃত করা হয়। এই দিবসে সর্বমোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন। ঈদের আনন্দ হিসেবে সবাইকে মিষ্টি মুখ করানো হয়। এরপর সভাপতি সাহেব সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। সবশেষে স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেব এর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

ডা. বশির আহমদ

নায়েব কায়েদ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ফতুল্লা।

শোক সংবাদ

মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন (মাস্টার) আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, সুন্দরবনের প্রথম আহমদীয়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন। তিনি গত ১১ইং ডিসেম্বর বাংলা ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৪১৫ (১২ই জিলহজ্জ) রোজ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব তার নিজ ভবনে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনের সুন্দরবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর প্রথম ছাত্র ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ৪ মেয়ে এবং ১ ছেলে সহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। উল্লেখ্য যে, তিনি অত্র এলাকায় ইংরেজীর জাহাজ নামে পরিচিত ছিলেন।

রেবেকা সুলতানা (প্রেসিডেন্ট)

লাজনা ইমাইল্লাহ্, সাতক্ষীরা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

দ্বায়িত্বশীল গৃহশিক্ষক খুঁজছেন?

১ম থেকে ৮ম শ্রেণী– সকল বিষয়

৯ম থেকে দ্বাদশ – বাণিজ্য বিভাগ

এছাড়া সকল শ্রেণীর ও সকল বিভাগের বিষয় ভিত্তিক টিউটর (যেমন গণিত, ইংরেজী, বিজ্ঞান ইত্যাদি)-এর জন্যে যোগাযোগ করুন–

ম. ই. স্বপন –০১৫৫৪৩৫১২৯২/০১৯১৩০৪৯৪১৩

বি,কম (সম্মান) এম,কম (ম্যানেজমেন্ট)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষক, ট্যালেন্টস্ হাই স্কুল

হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদ পুর ঢাকা।

এ পক্ষের কৃষি

১ জানুয়ারী থেকে ১৫ জানুয়ারী

১৮ পৌষ হতে ২ মাঘ

১) আমন ফসল – এপক্ষকালে দক্ষিণ অঞ্চলের নাবি জাতের আমন কাটাও শেষ হয়ে যাবে। দক্ষিণ অঞ্চলে এপক্ষকালে নিম্নের কাজগুলো করা যেতে পারে।

মুগডাল, তিল চাষের জমি তৈরী করে বীজ সংগ্রহ করা। বিনা-৫ জাতের বিএডিসি'র

মুগডাল বীজ ব্যবহার করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে। বিএডিসি'র বীজ ডিলারের নিকট যোগাযোগ করা যেতে পারে।

আগাম খরিফ সব্জি চাষের জমি তৈরী করতে হবে। আগাম সব্জী হিসেবে ডাটা, ঢেঁরস, বরবটি, বেগুন চাষ করা যায়। বিএডিসি'র বীজ ডিলারের নিকট যোগাযোগ করা যেতে পারে। ডিলারের নিকট বীজ পাওয়া না গেলে যে কোন প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের বীজ ব্যবহার করা যাবে।

গ্রীষ্মকালীন বেগুন চাষের জন্য এপক্ষকাল জমি তৈরী করার উপযুক্ত সময়। চারা তৈরী করে নাথাকলে চারা তৈরী করুন। বেগুন চাষের জন্য সেচ ও নিষ্কাষণ সুবিধাযুক্ত উচ্চ দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করুন

এ পক্ষকালের মধ্যে গেমী (ভূই) কুমড়ার বীজ বপন শেষ করতে হবে।

ধান মাড়াই, সিদ্ধ, শুকানো, খরের পুঞ্জি দেয়ার কাজ শেষ করতে হবে।

পাকের ঘর, গোয়াল ঘরের চাল মেরামত শেষ করতে হবে।

ধান, গম, ডাল রাখার ডুলি, গোলা, পরিষ্কার, মেরামত/তৈরী করতে হবে।

২) ভূট্টা চাষ ঃ – বীজ বপনের ৫০-৫৫ দিন পর ভূট্টা গাছে ১০-১২টি পূর্ণ পাতা হবে। এসময়ে ২য় সেচ দিন এবং ইউরিয়া সারের ২য় কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে। আপনার ক্ষেতে মোচা বের হওয়া শুরু হলে অর্থাৎ বীজ বপনের ৬০-৭০ দিনের মধ্যে ৩য় সেচ দিন। গাছে রোগ দেখা দিলে দমনের ব্যবস্থা নিন। প্রয়োজনে খাকসারের সাথে অথবা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিন।

৩) গোল আলু চাষ ঃ – খেত প্রতিদিন পরিদর্শন করুন। এপক্ষে আপনার খেতের ফসলের বয়স ৪০-৪৫ দিন হবে। আপনি সেচ নালার ২/৩ অংশ ডুবিয়ে ২য় সেচ দিন। এপক্ষ থেকে কুয়াশা পড়া শুরু হবে। এছাড়া জাব পোকার আক্রমণ হবে। নিয়মিত বালাই ও আপদনাশক স্প্রে করুন। প্রয়োজনে খাকসারের সাথে অথবা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিন।

৪) কুমড়ার চাষ ঃ -

ক) মিষ্টি কুমড়া ঃ – আপনার বাড়ন্ত গাছের পরিচর্যা করুন। গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিন। খেত আগাছা মুক্ত রাখুন। নাবি খেতের বীজ বপনের ১৬/১৭ দিন পর মাদায় দুটি করে সুস্থ সবল চারা রেখে বাকী গাছ তুলে ফেলুন। গাছের ১৬/১৭ দিন বয়সে সারের প্রথম কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে সারের ২য় কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সার রিং পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে। মাটির রস বুঝে সেচ দিতে হবে।

পোকার আক্রমণ ও দমন ব্যবস্থা ঃ – এপক্ষকালে জাব পোকা এবং পামকিন বিটল আক্রমণ করতে পারে। কীটনাশক মালাথিয়ন-৫৭ প্রয়োগ করে দমন করুন। এ ছাড়া গাছে ফল ধরা শুরু হলে মাছি পোকায় আক্রমণ করতে পারে। বিষটোপ ফাঁদ পেতে মিষ্টি কুমড়ার মাছি পোকা দমন করুন। আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে দূরে মাটিতে পুতে রাখুন। প্রয়োজনে খাকসারের সাথে অথবা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিন।

খ) গেমী কুমড়া ঃ– এপক্ষে গেমী কুমড়ার বীজ বপন শেষ করুন।

৫) ডাল ফসল ঃ – খেত প্রতিদিন পরিদর্শন করা প্রয়োজন। এপক্ষকালে জাব পোকার আক্রমণ হবে। আক্রমণের প্রথম দিকে দমনের ব্যবস্থা নিন। খেতের যে অংশ থেকে বীজ রাখবেন বলে চিন্তা করেছেন। সে অংশের ভাল করে যত্ন নিন সময় সময় রগিং করুন অর্থাৎ অবাঞ্ছিত গাছ বিজাত তুলে ফেলুন।

৬) আখ চাষ– আপনার খেতের আখের চারার ১০-১২টি পাতা হলে ১ম কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে। উপরি প্রয়োগের পর নালায় হালকা মাটি দিয়ে সার ঢেকে দিতে হবে। নাবীতে আখ চাষের জমি এপক্ষকালেই প্রস্তুত করতে হবে।

(৭) তেল ফসল চাষ ঃ –

ক) সরিষা চাষ ঃ –সরিষা খেতের এখন ফুল শেষ পর্যায়। দানা পরিপুষ্ট হওয়ার সময়। এ সময়ে জাব পোকার আক্রমণ হবে। জাব পোকার আক্রমণে ফলনের প্রচুর ক্ষতি হয়। এছাড়া জাব পোকার

আক্রমণের সাথে সাথে অলটারনারিয়া রোগের আক্রমণ হয়। জাব পোকার আক্রমণ দমন করতে হবে। যদি অলটারনারিয়া রোগের আক্রমণ হয়ে যায় তাহলে আপদনাশক রুব্রল স্প্রে করুন।

খ) চিনা বাদাম ঃ–অন্তরবর্তী কালীন পরিচর্যা করুন। বাদাম গাছে ফুল আসে উপরে আর বাদাম মাটির নীচে। তাই গাছে ফুল আসা শুরু হলে গোড়ার মাটি তুলে দিন। ফুল ফোটা শুরু হলে গাছকে নড়ানো উচিত নয়।

৮। বোরো চাষ ঃ – এ পক্ষকালে বোরো চারা রোপন ব্যাপক ভাবে শুরু হবে। চারা রোপনের পূর্বে জমি উত্তমরূপে চাষ ও মই দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে। শেষ চাষে ইউরিয়া সার বাদে বাকী সকল সার নিম্নোক্ত হারে প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে খাকসারের সাথে অথবা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিন। প্রতি একরে সারের মাত্রা –

* জৈব সার – ২০০০ কেজি, * ইউরিয়া সার -১৩ কেজি, * টিএসপি সার -৫০ কেজি, * এমওপি- ৩৬ কেজি, * জিপসাম - ২৪ কেজি, দস্তা - ২ কেজি। সারের মাত্রা জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে কম বেশী হতে পারে।

স্যারিতে চারা রোপন করুন। চারা রোপনের পর জমিতে ছিপছিপে পানি রাখতে হবে। চারা রোপনের ১৪-১৫ দিন পর প্রথম কিস্তি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পূর্বে আগাছা পরিস্কার করুন। দানাদার ইউরিয়া সারের পরিবর্তে প্রতি ৪টি গোছার জন্য একটি করে মেঘা আকারের গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহার করলে ভাল ফলন পাওয়া যায় এবং সারের পরিমাণ কম লাগে।

৯) গম চাষ ঃ – এ পক্ষকালে অনেক জমির ফসলের বয়স ৩০-৩৫ দিন হবে। এ সকল জমিতে ২য় কিস্তি সার উপরি প্রয়োগ করুন। আর যে সকল জমির ফসলের বয়স ৫৫-৬০ দিন হবে সেসকল জমিতে ৩য় সেচ দিন এবং ৩য় কিস্তি সার উপরি প্রয়োগ করুন।

১০) শীতকালীন সব্জি ঃ – বাড়ন্ত শীতকালিন সব্জির খেতে মাটি তুলে দিন। বিশেষ করে বাঁধা কপি, ফুল কপি, মূলা খেতে গাছের গোড়ার মাটি তুলে দিন। মাটির রস বুঝে সেচ দিন।

রবি মরিচ চাষ ঃ – এ পক্ষকালে চারা রোপন শেষ করুন। টমেটো গাছের অরক্ষিত শাখা ছেটে ফেলুন। গাছ খুঁটিতে বেঁধে দিন। সঠিক সময়ে শীতকালিন সব্জি তুলুন এবং বিপনন করুন।

গেমী কুমড়ার চাষ প্রণালী

ভূমিকা ও ব্যবহার ঃ – গেমী কুমড়া একটি উষ্ণমন্ডলীয় এলাকার ফসল। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে ভাল জন্মে। তবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস এর নীচে নেমে গেলে উৎপাদন ব্যহত হয়। তাই ফসলটি দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাগুলোর চর এলাকায় ভাল জন্মে। এটি একটি কম লতানো গাছ। ফল গোলাকার। কচি অবস্থায় সবুজ থাকে। পরিপক্ক হলে ত্বকের উপর সাদা মোমের ন্যায় আবরণ পড়ে।

কচি ফল সব্জিরূপে এবং পরিপক্ক হলে সব্জি হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও মুরব্বা হালুয়া তৈরী করে খাওয়া যায়। এ সব্জিটি বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের উৎস এবং স্নায়ুতন্ত্রের উপকারী।

উৎপাদন পদ্ধতি :

১। পরিকল্পনা গ্রহণ ঃ – কোন কাজ শুরুর পূর্বে পরিকল্পনার বিকল্প নাই। আপনি যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে আপনি গেমী কুমড়ার চাষ করবেন। তাহলে আপনি নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

(ক) আপনি কোন জমিতে চাষ করতে চান তা এখনই নির্বাচন করুন।

(খ) পার্শ্ববর্তী চাষী ভাইকে চাষ করতে উদ্বুদ্ধ করুন।

(গ) ১৫ পৌষের মধ্যে জমি তৈরী করুন এবং বিজ বপন শেষ করুন।

(ঘ) বীজ নিজের না থাকলে কোথা থেকে এবং কিভাবে বীজ সংগ্রহ করবেন তা ঠিক করে নিন।

২। জমি প্লট / নির্বাচন ঃ– ভাল ফলনের জন্য উর্বর জমি নির্বাচন করুন। জমি নির্বচন কালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখতে হবে ঃ

জমি ছায়ামুক্ত রৌদ্রোজ্জ্বল হতে হবে।* মাটি দো-আঁশ/বেলে দো-আঁশ হতে হবে।* চর অঞ্চলের জমিকে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে।* জমি সমতল হতে হবে। সেচ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।* জমি পানি বাহিত রোগমুক্ত হতে হবে।* পর পর ৩ বছর চাষ করার পর জমি পরিবর্তন করতে হবে।

৩। জমি তৈরী ঃ – ৪/৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি পরিপাটি করে তৈরী করতে হবে। ৩০০ সে: মি: অন্তর অন্তর সারি করে প্রতি সারিতে ১৫০ সে: মি: অন্তর ৪৫ সে: মি: X ৪৫ সে:

মি: X৪৫ সে: মি: আকারের মাদা তৈরী করতে হবে।

৪। সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ – ভাল ফলনের জন্য সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করুন। আপনার জমিতে নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করতে পারেন।

ক) জৈব সার :

পঁচা গোবর/কম্পোস্ট প্রতি শতাংশে= ৪০ কেজি

খ) রাসায়নিক সার :

* ইউরিয়া প্রতি শতাংশে = ২৪০ গ্রাম

* টিএসপি প্রতি শতাংশে= ২০০ গ্রাম

* এম ও পি প্রতি শতাংশে = ২৪০ গ্রাম

* খৈল প্রতি শতাংশে = ৬০০ গ্রাম

সম্পূর্ণ টিএসপি সার এবং অর্ধেক গোবর সার = ২০ কেজি শেষ চাষে প্রতি শতাংশ জমিতে ছিটিয়ে মাটিতে উত্তমরূপে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রতি মাদায় গোবর সার ৩.২৫ কেজি এবং খৈল ১০০ গ্রাম হারে মাটিতে মিশিয়ে মাদা ভর্তি করতে হবে। এরপর সেচ দিয়ে সমস্ত জমি ভিজিয়ে দিন। ৭ দিন পর প্রতি মাদায় ৪/৫ টি করে বীজ বপন করে দিন। চারা গজালে প্রতি মাদায় ২ টি করে সুস্থ ও সবল গাছ রেখে বাকী গাছ সাবধানে তুলে ফেলুন।

৫। উপরি প্রয়োগ ঃ ইউরিয়া ও এমওপি সার সমান ৩ কিস্তিতে প্রতি মাদায় প্রতি কিস্তিতে ১৫ গ্রাম করে গাছের চার পার্শ্বে রিং পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রথম কিস্তি চারা গজানোর ১৫ দিন পর।

দ্বিতীয় কিস্তি গাছে ফুল ধরার সময়

তৃতীয় কিস্তি ফল ধরার পর।

৬। জাত নির্বাচন ঃ এটির কোন অনুমোদিত জাত নাই। রোগমুক্ত প্রচলিত জাত নির্বাচন করুন।

৭। বীজ সংগ্রহ ঃ প্রতিষ্ঠিত সংস্থা অর্থাৎ বিএডিসি'র বীজ ব্যবহার করুন। যদি বিএডিসি'র বীজ না পাওয়া যায় তাহলে নিজের রোগমুক্ত খেতের রোগমুক্ত গাছ থেকে পরিপক্ক ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। অথবা পরিচিত ভাল চাষীর নিকট থেকে বীজ সংগ্রহ করতে পারেন।

৮। বীজ শোধন ঃ বীজ বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজ ৩ গ্রাম ভিটাভেক্স – ২০০ দিয়ে শোধন করে বপন করলে বীজ বাহিত রোগ থেকে ফসল নিরাপদ থাকবে।

৯। বপনের মৌসুম ঃ অগ্রহায়ন-পৌষ মাস বীজ বপনের উত্তম সময়। বীজ বপণের পর খেত খর দিয়ে ঢেকে দিন।

১০। সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা ঃ প্রতি ২ সারির মাঝখানে ৩০ সে: মি: X ১৫ সে: মি: আকারের নালা তৈরী করে মাটি দুই দিকে তুলে দিলে বেড তৈরী হবে। প্রয়োজনে নালায় সেচ দেয়া যাবে। আবার বৃষ্টিপাত হলে পানি নিষ্কাশন করা যাবে।

১১। অঙ্গ ছাটাই ঃ অঙ্গ ছাটাই করলে ফলন বৃদ্ধি এবং গুণাগুণ উন্নয়ন হয়। গাছের প্রধান কান্ড এবং ২/৩টি শাখা রেখে বাকী শাখা কঁচি অবস্থায় ধারালো চাকু দ্বারা কেটে দিতে হবে। গাছের গোড়ার দিকের কোন শাখা রাখা যাবে না।

সাবধানতা ঃ শাখা বড় হবার পর কাটলে গাছে ক্ষতি হবে। গাছের অগ্রভাগের পাতা ছোট হয়ে আসলে/ফ্যাকাশে হলে ছাটাই করে দূরে ফেলতে হবে।

১২। আগাছা দমন ঃ আগাছা গাছের প্রত্যক্ষ শত্রু। ইহা খাদ্য, পানি, আলো, বাতাস ও জায়গার জন্য গাছের সাথে প্রতিযোগিতা করে। আগাছা জন্মানোর সাথে সাথে নিড়ানি দিয়ে মূল সহ আগাছা দমন করতে হবে। বপণের ৪০/৪৫ দিন পর্যন্ত খেতে আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

১৩। পরপরাগায়ন ঃ কুমড়া জাতীয় সব্জি পরপরাগায়িত ফসল। খেতে যদি প্রচুর মৌমাছি না আসে তাহলে কৃত্রিম উপায় সাবধানে পরাগায়ন করে দিতে হবে। সকালে সম্পূর্ণ ফোটা পুরুষ ফুল সংগ্রহ করে সাবধানে পাঁপরি ছিড়ে ফেলে দিতে হবে। তার পর পুং কেশরটি স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডের উপরে ধরে ঝাঁকুনি/ টোকা দিলে পরাগরেনু গর্ভমুন্ডের উপর পরবে এবং পরপরাগায়িত হবে।

১৪। ফল সংগ্রহ ঃ বীজ বপণের ২ মাস পর থেকেই ফল ধরা শুরু হয়। পছন্দ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কঁচি এবং পাকা ফল বোঁটা সহ ধাপে ধাপে সংগ্রহ করা যায়। কুমড়া পাকলে উপরিভাগে সাদা মোমের ন্যায় আবরণ পরে এবং বোঁটা শুকিয়ে আসে। পাকা ফল সংগ্রহ করলে কয়েক মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। বোঁটার কাটা মাথায় মোম লাগিয়ে সংরক্ষণের মেয়াদ বড়ানো যায়।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
সেক্রেটারী জিরায়া'ত
আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৯১৩৫২০৬৭২

কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পুরস্কার ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশের তালিম বিভাগের পক্ষ থেকে ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের পাবলিক পরীক্ষাসমূহের সর্বশেষ প্রকাশিত ফলাফলের ভিত্তিতে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হবে, ইনশাআল্লাহ।
পাবলিক পরীক্ষাগুলো হল-

পাবলিক পরীক্ষা	পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম ফলাফল (CGPA)
এস.এস.সি/ও লেভেল	(ক) বাংলা মাধ্যম- জিপিএ ৫ (পাঁচ)। (খ) ইংরেজি মাধ্যম- ৪টা ‘এ’।
এইচ.এস.সি/এ লেভেল	(ক) বাংলা মাধ্যম- জিপিএ ৫ (পাঁচ)। (খ) ইংরেজি মাধ্যম- ২টা ‘এ’।
স্নাতক (সম্মান/পাসকোর্স)	(ক) যে কোন বিষয়ে ১ম শ্রেণী। (খ) যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেধাতালিকায় ১ম, ২য় অথবা ৩য় স্থান অর্জনকারী। (গ) যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে A- (এ মাইনাস) বা তার অধিকপ্রাপ্ত (লেটার গ্রেডে রেজাল্টপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে)।
এম.বি.বি.এস	যে কোন সরকারী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জনকারী।
ইঞ্জিনিয়ারিং (স্নাতকস্নাতকোত্তর)	(ক) যে কোন বিষয়ে ১ম শ্রেণী। (খ) যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেধাতালিকায় ১ম, ২য় অথবা ৩য় স্থান অর্জনকারী। (গ) যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে A- (এ মাইনাস) বা তার অধিকপ্রাপ্ত (লেটার গ্রেডে রেজাল্টপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে)।
মাস্টার্স	(ক) যে কোন বিষয়ে ১ম শ্রেণী। (খ) যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেধাতালিকায় ১ম, ২য় অথবা ৩য় স্থান অর্জনকারী। (গ) যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে Distinction প্রাপ্ত।
পিএইচডি/এমফিল	যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি/এমফিল ডিগ্রি অর্জনকারী।

যারা উপরোক্ত ফলাফল অর্জন করেছে তাদেরকে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবানদের সাথে অতি সত্ত্বর যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ওয়াসসালাম।

কনভেনর

পুরস্কার প্রদান সেল

তালিম দফ্তর

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ।

পাক্ষিক আহমদী গ্রাহক ফরম

নবায়ন / নতুন গ্রাহক	সদস্য কোড (কেন্দ্র পূরণ করবে) ঃ

গ্রাহকের নাম ঃ-

বাংলা ঃ ....

ইংরেজী (ছাপার অক্ষরে) ঃ ....

পিতা / স্বামীর নাম (ইংরেজী বড় অক্ষরে) ঃ ....

জামাতের নাম ঃ ....

হালকা ঃ ....

ফোন/ মোবাইল নং ঃ ....

ই-মেইলঃ ঃ

ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর সঠিক ঠিকানা ঃ

গ্রাম/ মহল্লা ঃ ....

পোস্ট ঃ ....

থানা ঃ .... পোস্ট কোডঃ ....

জেলা ঃ ....

প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণ ঃ .... (কথায় ঃ .... টাকা)

বই নং ঃ .... রশিদ নং ঃ .... তারিখ ঃ ....

বিঃ দ্রঃ অনুগ্রহপূর্বক স্থানীয় জামাআতে গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করে রশিদের ফটোকপি ফরমের সাথে সংযুক্ত পূরণ করে কেন্দ্রে প্রেরণ করুন।

গ্রাহকের স্বাক্ষর

স্বাক্ষর
স্থানীয় আমীর/ প্রেসিডেন্ট

* পাক্ষিক আহমদীর গ্রাহক হওয়া সম্পর্কে কোন তথ্য জানতে হলে যোগাযোগ করুন ঃ **০১৯১৮-৩০০১৫৬**